মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৪

মে ২০১৫ ইং, রজব ১৪৩৬ হি., বৈশাখ ১৪২২ বাং

رجب ١٤٣٦ مايو ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৫ ..... ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১০
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
অসুস্থতাও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত..... ১১
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত (প্রাণীর) ছবি ও ভিডিওর হুকুম ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৬..... ২০
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
"এক মুহূর্ত ফিকির করা ৬০ বছর ইবাদত হতে উত্তম"..... ২৪
মুফতী আব্দুস সালাম নো'মানী
কওমী মাদরাসা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য বনাম বাস্তবতা..... ২৬
মাওলানা শরীফ উসমানী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১৩..... ৩০
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১২..... ৩৬
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩
মলফূজাতে আকাবের ৪৭
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

ভয়াবহ ভূমিকম্প : আমাদের করণীয়

দুই দিন আগেই নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশে সংঘটিত হলো অত্যন্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প। পর পর আরো কয়েকবার এসব এলাকায় ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে বলেও খবরে প্রকাশ। হিসাবানুযায়ী, এই ভূমিকম্পে নেপালে প্রাণহানির সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গেলেও মূল পরিসংখ্যান কত, তা জানা দুষ্কর। সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নেপালের রাস্তাঘাট-ঘরবাড়ি–সবই এক নিমেষেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এ যেন এক মৃত্যু উপত্যকা এবং শত বছরের ধ্বংসাবশেষ। তা ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের তাণ্ডব। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত রিখটার স্কেল অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.৯। বাংলাদেশেও এই ভূমিকম্পে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যদিও নেপালের তুলনায় এ দেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম।

কিন্তু এরূপ ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কেন হয়? আমাদের একটা চিরাচরিত অভ্যাস হয়ে গেছে, যেকোনো বিপদাপদকে আমরা এখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপরই পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে এর মোকাবিলা করার ঘোষণা দিই। এর কোনো ঐশী বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে কি না, ঐশী বা আধ্যাত্মিকভাবে এর কোনো সমাধান আছে কি না, এর প্রতি দৃষ্টিপাতের কোনো গরজই লক্ষ করা যায় না।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার কারণে এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো আমরা গ্রহণ করলেও এটিকে শেষ কথা মনে করা এবং চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে গ্রহণ করার কোনোই উপায় নেই। স্বয়ং বিজ্ঞানও বলতে পারবে না এটিই শেষ কথা বা এটিই শেষ সমাধান।

এতদসত্ত্বেও আমরা মুসলমান হিসেবে মানবতার এরূপ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে আমলে এনে অন্য সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে আহ্বান করার নামান্তর হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী, মানবজাতির কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর গজব এবং মানব সম্প্রদায়কে তাদের কৃত পাপাচারের ব্যাপারে সতর্কবাণীস্বরূপ এসব বিপদাপদ ও দুর্যোগ এসে থাকে। মুসলমানদের পরম বিশ্বাসও এটি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস শরীফে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করবে, জাকাতকে ট্যাক্স মনে করবে, দুনিয়া কামানোর জন্য ইলম অর্জন করবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে; কিন্তু তার মায়ের সাথে বিরূপ আচরণ করবে, বন্ধুকে কাছে টেনে নেবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল হবে, ফাসেক ব্যক্তি জাতির শাসক রূপে আবির্ভূত হবে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, দুষ্টু লোককে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করা হবে, নর্তকি ও গায়িকাদের দৌরাত্ম্য ও তাদের ব্যাপক ছড়াছড়ি হবে, মদ পান করা হবে, উত্তরসূরিগণ পূর্বসূরিদের অভিশাপ দেবে, সে সময় তোমরা ধূম্র অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধস, ভূমিকম্প ও মানবাকৃতির বিকৃতির অপেক্ষা করো। [তিরমিযী ৪/৪৯৪, হা. ২২১১]

আরেক হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং খুন-খারাবি বৃদ্ধি পাবে, তোমাদের সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে। [সহীহ বোখারী, হা. ৯৭৯]

এরূপ বহু হাদীস ও কোরআনের আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আল্লাহর গজব এবং মানুষের কৃত অপকর্মের ফলস্বরূপ। আবার পবিত্র কোরআন-হাদীসে এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য, পাপাচারমুক্ত জীবনগঠন, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, তাওবা করা, আল্লাহর স্মরণ করা, দু'আ করা ইত্যাদি দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এমন স্পষ্ট বাণী থাকার পরও যদি এসব দুর্যোগকে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাগুলো আমলে না নেওয়া হয় এবং এর ফলে দুর্যোগের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে এর দায়ভার কে নেবে? দুর্যোগ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করা অন্যতম মানবাধিকার। একসময় ছিল, যখন মুসলমানদের মাঝে দুর্যোগ দেখা দিলে শাসকগণ কড়া নজর রাখতেন, সমাজে কোনো প্রকার পাপাচার সংঘটিত হচ্ছে কি না। সকলকে নিয়ে তাওবা ইস্তিগফার করতেন। দু'আ করতেন। দান-খয়রাত করার উপদেশ দিতেন। তাতে দুর্যোগ থেকে জনগণ নিরাপদ থাকত।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.) সূর্যগ্রহণ দেখলে বলতেন, যদি তুমি এ রকম কিছু দেখে থাকো, তখন দ্রুত আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করো, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। [বোখারী ২/৩০ এবং মুসলিম ২/৬২৮]

বর্ণিত আছে, ভূমিকম্প সংঘটিত হতে দেখলে, উমর ইবনে আব্দুল আযিয (রহ.) তাঁর গভর্নরদের দান করার কথা লিখে চিঠি লিখতেন।

বর্তমান আধুনিক যুগেও যদি আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রস্তুতির পাশাপাশি পবিত্র কোরআন-হাদীস এবং পূর্বসূরি শাসক-শাসিতের পথ অবলম্বন করি নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যাবতীয় দুর্যোগ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন, ইনশাআল্লাহ।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৭/০৪/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١١) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٢) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (١٣) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥)

আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (১০) আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল জালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি। (১১) অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। (১২) তাদেরকে বলা হলো পলায়ন করো না এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। (১৩) তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম জালিম। (১৪) তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ না করি। (১৫) (আম্বিয়া ১০-১৫)

আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র কালামের ফজীলত বর্ণনা করতঃ এর মর্যাদার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির নিমিত্তে বলেন, তোমাদের ওপর আমি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের শরীয়ত এবং তোমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ও জ্ঞান লাভ করবে না? তোমরা কি এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতের কদর করবে না? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

انه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون

"তোমার জন্য ও তোমার কওমের জন্য এটা উপদেশ এবং সত্বরই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। (৪৩:৪৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল জালিম। অন্য স্থানে রয়েছে, "নূহের (আ.) পরে আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি।" আরেক স্থানে আছে, "এমন বহু জনপদ, যা পূর্বে উন্নতি ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল, কিন্তু পরে জনগণের জুলুমের কারণে আমি ওগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর আমি তাদের স্থলে সৃষ্টি করেছি অপর জাতিকে। এক কওমের পর অন্য কওম এবং এরপর আরেক কওম, এভাবেই একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে থেকেছে।

যখন ওই সকল লোক শাস্তি আসতে দেখে নেয় তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আল্লাহর নবীর ফরমান মোতাবেক আল্লাহর শাস্তি এসে গেছে। তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। এদিক-ওদিক তারা দৌড়াতে শুরু করে। তখন তাদেরকে বলা হয়, পলায়ন করো না, বরং নিজেদের প্রাসাদের দিকে এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-সামগ্রীর দিকে ফিরে আসো। তোমাদের সাথে প্রশ্নোত্তর চলবে যে, তোমরা আল্লাহর নিয়ামত রাজির জন্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কি না। এই নির্দেশ হবে তাদেরকে ধমক দেওয়ার এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য। ওই সময় তারা নিজেদের পাপরাশির কথা স্বীকার করে নেবে। তারা স্পষ্টভাবে বলবে, আমরা তো ছিলাম অত্যাচারী-জালিম।" কিন্তু তখন স্বীকার করার দ্বারা কোনোই লাভ হবে না। আল্লাহ পাক বলেন, তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ না করি।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের হাজুরা ও কালাবা জনপদসমূহ ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নাম এক রেওয়াত অনুযায়ী মুসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুআইব বলা হয়েছে। শুআইব নাম হলে তিনি মাদাইনবাসী শুআইব (আ.) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফির বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেমন ফিলিস্তিনে বনী ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের ওপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেওয়া হয়। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৫

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

হাদীস নং ১২ :

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة فى وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء

قال فجثا أعرابى على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون فى الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه

হযরত আবু দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের হাশর এমনভাবে করবেন যে, তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। তারা মুক্তার মিম্বরে বসা থাকবে। অন্যান্য লোক তাদের প্রতি ঈর্ষা করতে থাকবে। তারা নবীও হবেন না, শহীদও হবেন না। কেউ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের অবস্থা বলে দিন, যাতে আমরা তাদের চিনে নিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তারা ওই সব লোক, যারা বিভিন্ন এলাকা হতে এবং বিভিন্ন খানদান হতে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হবে।

(আল মু'জামুল কাবীর [জামেউল মাসানীদ] ১৩/৫৬৮ হা. ১১০১৭, দুররে মানসূর ১/৩৬৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৭ হা. ১৬৭৭০, আত-তারগীব ২/২৬২ হা. ২২৪০)

হাদীসটির মূল ইবারত মুজামুল কবীর থেকে চয়ন করা হয়েছে।

হাদীসটির মান : হাসান। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৭ হা. ১৬৭৭০)

এই হাদীসের সাথে আরো দুটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

عن ابى مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ .... ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ " :يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ، النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ ."فَجَثَى رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ، وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا نَبِيَّ اللهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ انْعَتْهُمْ لَنَا ، يَعْنِي صِفْهُمْ لَنَا، شَكِّلْهُمْ لَنَا فَسُرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ تَحَابُّوا فِي اللهِ وَتَصَافَوْا، يَضَعُ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، وَثِيَابَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২৭৬ হা. ১৭৯৯৬, মুসনাদে আহমদ ৫/৩৪১ হা. ২২৯৬০, আল মু'জামুল কাবীর ৩/২৯০ হা. ৩৪৩৪, সহীহে ইবনে হিব্বান [আল ইহসান] ২/৩৩২ হা. ৫৭৩ হযরত আবু হুরায়রার সূত্রে)

হাদীসটির মান : হাসান।

سَمِعْتُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ قَالَ :قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ :الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَلَاقُونَ فِي اللهِ

জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের অসংখ্য খুঁটি হবে। যার ওপর যাবারজাদ (যুমুররুদ) পাথরের বালাখানা হবে। তাতে চারিদিকে দরজাসমূহ খোলা থাকবে। তা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ঝলমল করতে থাকবে। এসব বালাখানার মধ্যে ওই সব লোক অবস্থান করবে, যারা একে অপরের সাথে আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখে, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে এক জায়গায় জমা হয় এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে।

(শুআবুল ঈমান ৬/৪৮৭ হা. ৯০০১, জামেউস সগীর ১/৪৮৩ হা. ২৩১৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২৭৮ হা. ১৮০০৭, মিশকাত শরীফ ৩/১৬৯৮)

মান : হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. এক হাদীসে আছে, যে ঘরে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হয়, তা আসমানবাসীদের নিকট এমন চমকায়, যেমন দুনিয়াবাসীদের নিকট নক্ষত্র চমকায়।

عن سابط إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيهِ لَيُضِىءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، كَمَا تُضِىءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ

(জামেউস সগীর ১/৪১৬ হা. ১৯৬১, কানযুল উম্মাল ১/৪২৪ হা. ১৮১৮, আল ইসাবা ৩/৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ. আরেক হাদীসে আছে, যিকিরের মজলিসসমূহের ওপর সাকীনা (এক প্রকার বিশেষ নিয়ামত) নাযিল হয়। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয়। আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর তাদের আলোচনা করে।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة، وتحف بهم الملائكة، وتغاشهم الرحمة، ويذكرهم الله على عرشه

(হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/১১৮, তারিখে বাগদাদ ৩/১২৮)

হাদীসটির মান : সহীহ। (এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য [তারিখে বাগদাদ ৩/১২৮])

গ. হযরত আবু রযীন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, তোমাকে দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধিকারী বস্তু বলে দেব কি? যা দ্বারা তুমি উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করবে। তা হলো, যিকিরের মজলিস। একে মজবুত করে ধরো। যখন তুমি একাকী হও, তখন যত পারো আল্লাহর যিকির করতে থাকো।

عَنْ أَبِى رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَلَاكِ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِى تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟، عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ، وَأَحِبَّ فِى اللّٰهِ، وَأَبْغِضْ فِى اللّٰهِ... فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِى ذَلِكَ فَافْعَلْ "

(শুআবুল ঈমান ১১/৩২৯ হা. ৮৬০৮, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৩৬৭, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩/১৯৮ হা. ৫০২৫)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঘ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যে সমস্ত ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয়, আসমানবাসীগণ ওই ঘরগুলোকে এরূপ উজ্জ্বল দেখেন, যেমন জমিনবাসীগণ তারকাসমূহকে আলোকিত দেখে, যে সকল ঘরে আল্লাহর যিকির হয়, সেগুলো এমন আলোকিত ও নূরানী হয় যে, নূরের কারণে তারকার মতো চমকায়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَرَوْنَ بُيُوتَ أَهْلِ الذِّكْرِ تُضِىءُ لَهُمْ كَمَا تُضِىءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৩/৪৫৬ হা. ৩৬২০৩)

হাদীসটির মান : 'হাসান' লিগাইরিহী।

হাদীস নং ১৩ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوا "، قَالُوا :وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ " :حِلَقُ الذِّكْرِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহের নিকট দিয়ে যাও, তখন সেখানে খুব বিচরণ করো। কেউ আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের বাগানসমূহ কী? ইরশাদ করেন, যিকিরের হালকাসমূহ।

(মুসনাদে আহমদ ৩/১৫০ হা. ১২৫৩১, তিরমিযী শরীফ ২/১৯১ হা. ৩৫১০, মিশকাত শরীফ ২/৭০২ হা. ২২৭১, শু'আবুল ঈমান ১/৩৯৮ হা. ৫২৯, মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/৩৪৫ হা. ১৮৬০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৭৪ হা. ১৮২০, জামেউস সগীর ১/১৮৭ হা. ৮৫৭)

হাদীসটির মান : সহীহ (জামেউস সগীর ১/১৮৭)

ক. এক হাদীসে আছে, 'আল্লাহর যিকির দিলের জন্য শেফা।

عن أنس ذكر الله شفاء القلوب

(জামেউস সাগীর ২/৮৯৯ হা. ৪২৩০, শুআবুল ঈমান ১/৪৫৯ হা. ৭১৭, কানযুল উম্মাল ১/৪১৪ হা. ১৭৫১, কাশফুল খফা ১/৪১৯ হা. ১৩৪৫, আয যুহদ লি আবীদাউদ ১/২০৮ হা.২২৬)

হাদীসটির মান : হাসান লি শাওয়াহিদিহী (কাশফুল খফা)

খ. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতে হুকুম করছি। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কারো পেছনে

কোনো দুশমন লেগে গেল আর সে তার নিকট হতে পালিয়ে দুর্গে নিরাপদ আশ্রয় নিল। যিকিরকারী আল্লাহর সঙ্গী হয়। এর চেয়ে বড় ফায়দা আর কী হবে যে, সে সমস্ত জগতের বাদশার সঙ্গী হয়ে যায়।

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ....وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ كَثِيرًا وَمَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ، وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ "

(মুসনাদে আহমদ ৪/১৩০ হা. ১৭১৭৫, তিরমিযী ২/১১৩ হা. ২৮৬৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৪/১২৪ হা. ৬২৩৩, সহীহে ইবনে খুজাইমা ২/৬৪ হা. ৯৩০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪২২ হা. ১৫৩৪)

হাদীসটির মান : সহীহ (তিরমিযী)

গ. হযরত আবু উমামা (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে এক ব্যক্তি আরজ করলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, যখনই আপনি ঘরে প্রবেশ করেন অথবা ঘর হতে বাইরে আসেন অথবা দাঁড়িয়ে থাকেন অথবা বসে থাকেন ফেরেশতা আপনার জন্য দু'আ করে। হযরত আবু উমামা (রা.) বললেন, তুমি চাইলে ফেরেশতা তোমার জন্যও দু'আ করতে পারে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الخ

حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ :يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْكَ كُلَّمَا دَخَلْتَ، وَكُلَّمَا خَرَجْتَ، وَكُلَّمَا قُمْتَ، وَكُلَّمَا جَلَسْتَ .قَالَ أَبُو أُمَامَةَ " :اللَّهُمَّ غُفْرًا دَعُونَا عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ لَوْ شِئْتُمْ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، ثُمَّ قَرَأَ :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) (الأحزاب٤٢ :)

(মুসতাদরাকে হাকেম ২/৪১৮ হা. ৩৫৬৫, দালাইলুন নবুওয়াহ ৭/২৫)

হাদীসটির মান : সহীহ (মুসতাদরাকে হাকেম)

হাদীস নং ১৪ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত্রে মেহনত করতে অক্ষম, কৃপণতার কারণে মালও খরচ করতে পারে না এবং কাপুরুষতা কারণে জেহাদেও শরীক হতে পারে না, তার জন্য উচিত, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে।

(আল মু'জামুল কাবীর ১১/৮৪ হা. ১১১২১, শু'আবুল ঈমান ১/৩৯১ হা. ৫০৮, আততারগীব ২/১৫৪ হা. ২০১০)

হাদীসটির মান : সহীহ লিগাইরিহী।

ক. হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর যিকির ঈমানের আলামত, মোনাফেকী হতে পবিত্রতা, শয়তান হতে হেফাজত ও জাহান্নাম হতে রক্ষার উপায়।

وعن أنس قال :قال رسول الله -عليه السلام ذكر الله علم الإيمان وبراءة من النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النار

(রুহুল বায়ান ৪/২৬৩, আদদুরার ৩/১৪১৫)

খ. এক হাদীসে আছে, শয়তান হাঁটু গেড়ে বসে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান অপারগ ও অপদস্থ হয়ে পেছনে হটে যায়।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذا غفَلَ وسوس

(মুসতাদরাকে হাকেম ২/৫৪১ হা. ৩৯৯১, মুসনাদে আহমদ ৪/২২৩ হা. ৪২৮৫, মেশকাত শরীফ ২/৭০৫ হা. ২২৮১, বুখারী শরীফ [তালীকান] ২/৭৪৪)

হাদীসটি হাসান।

গ. এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান তার নাকের অগ্রভাগ মানুষের দিলের ওপর রেখে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন সে বেইজ্জতি হয়ে পেছনে সরে যায়। আর যখন সে গাফেল হয় তখন তার দিলকে গ্রাস করে ফেলে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ

(মুসনাদে আবী ইয়ালা ৪/২২২ হা. ৪২৮৫, মাকাঈদুশ শায়তান [ইবনে আবীদ দুনিয়া] ১/৪০২হা. ৫৪০, শুআবুল ঈমান ১/৪০২ হা. ৫৪০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৪৯, জামেউস সগীর ১/৪৩০ ২০৩১)

হাদীসটি তার শাওয়াহেদের কারণে 'হাসান'।

হাদীস নং ১৫ :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " :أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا :مَجْنُونٌ "

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর যিকির এত বেশি করতে থাকো যে লোকেরা পাগল বলে।

(মুসনাদে আহমদ ৩/৬৮ হা. ১১৬৫৯, মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/১৩০ হা. ১৩৭১, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৯৯ হা. ৮১৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৯ হা. ১৮৩৯)

হাদীসটির মান : হাসান

এর অধীনে আরেকটি হাদীস :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ إِنَّكُمْ تُرَاءُونَ

আরেক হাদীসে আছে, এমনভাবে যিকির করতে থাকো, মোনাফেকরা তোমাদের রিয়াকার বলে।

(মু'জামুল কাবীর ১২/১৬৯ হা. ১২৭৮৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৬ হা. ১৬৭৬২, শু'আবুল ঈমান ১/৩৯৭ হা. ৫২৭, আত-তারগীব ২/২৫৬ হা. ২২১৮, দুররে মানসূর ৬/৬২০)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. ইবনে কাসীর (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর যেকোনো জিনিস ফরজ করেছেন এর একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ওজর হলে তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যিকিরের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى :(اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا) : إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضْ (عَلَى عِبَادِهِ) فَرِيضَةً إِلَّا (جَعَلَ لَهَا حَدًّا مَعْلُومًا، ثُمَّ) عَذَرَ أَهْلَهَا فِي حَالِ عُذْرٍ، غَيْرَ الذِّكْرِ، فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَلَمْ يَعْذُرْ أَحَدًا فِى تَرْكِهِ، إِلَّا مَغْلُوبًا عَلَى تَرْكِهِ، فَقَالَ :(فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) (النِّسَاء ١٠٣) ، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، (فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) ، وَفِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ، وَالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ :(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا) فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ صَلَّى عَلَيْكُمْ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ.

(জামেউল বায়ান, ইবনে জারীর তাবারী ১০/২২ হা. ১৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৫০৩, তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ৯/৩১৩৮ হা. ১৭৭০১)

হাদীসটির মান : হাসান

খ. হাফেজ ইবনে হাজর (রহ.) মুনাব্বিহাত কিতাবে লেখেছেন, কোরআন পাকের আয়াত وكان تحته كنزلهما সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তা স্বর্ণের একটি পাত ছিল। যাতে সাতটি লাইন লেখা ছিল।

১। আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও কেমন করে হাসে।

২। আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস রেখেও এর প্রতি আকৃষ্ট।

৩। আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে তাকদীরকে বিশ্বাস করে অথচ কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে আফসোস করে।

৪। আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে আখেরাতের হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস করে তবুও সে ধন-সম্পদ জমা করে।

৫। আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে জাহান্নামের আগুনকে বিশ্বাস করে তবুও সে গোনাহে লিপ্ত হয়।

৬। আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে আল্লাহকে জানে তবুও সে দুনিয়ার কোনো জিনিসের মধ্যে শান্তি লাভ করে।

কোনো কোনো বর্ণনায় আরেকটি লাইন রয়েছে যে, আমি আশ্চার্যবোধ করি ওই ব্যক্তির ওপর, যে শয়তানকে দুশমন বলে জানে তবুও তার আনুগত্য করে।

وَأخرج الشِّيرَازِيّ فِي الألقاب عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ :كَانَ اللَّوْح الَّذِي ذكر الله تَعَالَى فِي كِتَابه (وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما) حجر منقوراً فِيهِ :بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم عجبا لمن يعلم أَن الْقدر حق كَيفَ يحزن

وعجباً لمن يعلم أَن الْمَوْت حق كَيفَ يفرح

وعجباً لمن يرى الدُّنْيَا وغرورها وَتَقَلُّبهَا بِأَهْلِهَا كَيفَ يطمئن إِلَيْهَا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

وَأخرج الخرائطي فِي قمع الْحِرْص وَابْن عَسَاكِر من طَرِيق أبي حَازِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى :(وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما) قَالَ :لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ :بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم عجبا لمن يعرف الْمَوْت كَيفَ يفرح

وعجباً لمن يعرف النَّار كَيفَ يضْحك

وعجباً لمن يعرف الدُّنْيَا وَتَقَلُّبهَا بِأَهْلِهَا كَيفَ يطمئن إِلَيْهَا

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরজায় পড়ে থাকতেন এবং অত্যধিক পরিমাণে ও উচ্চস্বরে যিকির করতেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, এইভাবে উচ্চস্বরে যিকির করে; লোকটা কি রিয়াকার। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, না সে কোমল প্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি তবুক যুদ্ধে ইন্তিকাল করেন। সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন রাত্রে কবরসমূহের নিকট বাতি জ্বলছে। নিকটে গিয়ে দেখলেন, রাসূল (সা.) নিজে কবরের মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) কে বলছেন–নাও, তোমার ভাইয়ের লাশ আমার হাতে তুলে দাও। তাঁরা উঠিয়ে দিলেন। দাফন শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! আমি এই ব্যক্তির ওপর রাজি, আপনিও রাজি হয়ে যান। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই দৃশ্য দেখে আমার আকাঙ্ক্ষা হলো হায় এই লাশটি যদি আমার হতো!

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلٌ من مُزَيْنَةَ وهو ذُو البِجَادَيْنِ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عَمِّهِ وَكَانَ يُعْطِيهِ وَكَانَ مُحْسِنًا إِلَيْهِ فَبَلَغَ عَمَّهُ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ :إِنْ فَعَلْتَ وَتَبِعْتَ دِينَ مُحَمَّدٍ لَأَنْزِعَنَّ عنكَ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتُكَ، قَالَ :فَإِنِّي مُسْلِمٌ، فَنَزَعَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَاهُ حَتَّى جَرَّدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَأَتَى أُمَّهُ فَقَطَعَتْ لَهُ بِجَادًا لَهَا بِاثْنَتَيْنِ فَاتَّزَرَ نِصْفًا وَارْتَدَى نِصْفًا، ثُمَّ أَصْبَحَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَفَّحَ النَّاسَ يَنْظُرُ مَنْ أَتَاهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ له " :مَنْ أَنْتَ؟ " قَالَ :أَنَا عَبْدُ الْعُزَّى، قَالَ " :بَلْ أَنْتَ عَبْدُ اللهِ ذُو البِجَادَيْنِ "فَالْتَزِمْ بَابِي فَكَانَ يَلْزَمُ بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :يَا رَسُولَ اللهِ، أَمُرَاءٍ هُوَ؟ قَالَ " :دَعْهُ عَنْكَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَوَّاهِينَ "

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود، كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ :قُمْتُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ :فَرَأَيْتُ شُعْلَةً مِنْ نَارٍ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، قَالَ :فَاتَّبَعْتُهَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَإِذَا عَبْدُ اللهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ الْمُزَنِيُّ قَدْ مَاتَ، فَإِذَا هُمْ قَدْ حَفَرُوا لَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وعجباً لمن أَيقَن بِالْقَضَاءِ وَالْقدر كَيفَ ينصب فِي طلب الرزق

وعجباً لمن يُؤمن بِالْحِسَابِ كَيفَ يعْمل الْخَطَايَا

لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله :(وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما) قَالَ :لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ :شهِدت أَن لَا إِلَه إِلَّا الله شهِدت أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله عجبت لمن يُؤمن بِالْقدرِ كَيفَ يحزن عجبت لمن يُؤمن بِالْمَوْتِ كَيفَ يفرح

عجبت لمن تفكر فِي تقلب اللَّيْل وَالنَّهَار ويأمن فجأتهما حَالا فحالاً

وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس (وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما) قَالَ :مَا كَانَ ذَهَبا وَلَا فضَّة كَانَ صحفاً عَلَيْهَا

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الإِيمان عَن عَليّ بن أبي طَالب فِي قَول الله عز وَجل :(وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما) قَالَ :كَانَ لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ :لَا إِلَه الله إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

عجبا لمن يذكر الْمَوْت حق كَيفَ يفرح

وعجباً لمن يذكر أَن النَّار حق كَيفَ يضْحك

وعجباً لمن يذكر أَن الْقدر حق كَيفَ يحزن

وعجباً لمن يرى الدُّنْيَا وتصرفها بِأَهْلِهَا حَالا بعد حَال كَيفَ يطمئن إِلَيْهَا

(তাফসীরে দুররে মানসূর ৫/৪২১, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/১৬৮, তাফসীরুল ওয়াসীত লিল ওয়াহেদী ৩/১৬২, শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ৪/৭৫৩, আমালী ইবনু বুশরান ১/২৪২)

গ. হযরত আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন (রা.) একজন সাহাবী, যিনি শৈশবে এতীম হয়ে যান। চাচার কাছে থাকতেন। চাচা অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁকে লালন-পালন করতেন। ঘরের কাউকে না জানিয়েই গোপনে তিনি মুসলমান হয়ে যান। চাচা তা জানতে পেরে খুবই রাগান্বিত হয়ে উলঙ্গ করে তাঁকে বাড়ি হতে বের করে দেন। মাও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবুও মায়ের মন–উলঙ্গ দেখে তাঁকে একটি মোটা চাদর দিয়ে দিলেন। তিনি চাদরটি দুই ভাগ করে নিচের ওপরে পরিধান করলেন। অতঃপর মদীনা শরীফ হাজির হলেন। এখানে

وَسَلَّمَ فِي حُفْرَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُدْلِيَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ :أَدْلِيَا لِي أَخَاكُمَا، فَدَلَّوْهُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا هَيَّأَهُ لِشِقِّهِ قَالَ :اللهُمَّ إِنِّي قَدْ أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، قَالَ :يَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ

(শু'আবুল ঈমান ৪/১৮৫ হা. ২৩৬৮, আল-ইসাবা ৪/১৩৯ হা. ৪৮২২, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/১২২, উসদুল গাবা ৩/১২৪ হা. ২৯৯২৮)

হাদীসটির মান : হাসান।

ঘ. এক হাদীসে এসেছে, কোনো কোনো মানুষ যিকিরের চাবিস্বরূপ। তাদেরকে দেখলেই আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِذِكْرِ اللهِ، إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ

(আল মু'জামুল কাবীর ১০/২৫৩ হা. ১০৪৭৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮ হা. ১৬৭৮০, শু'আবুল ঈমান ১/৪৫৫ হা. ৬৯৯, জামেউস সগীর ২/৫১২ হা. ২৪৬৬)

হাদীসটির মান : হাসান লিশাওয়াহিদিহী

ঙ. এক হাদীসে আছে, ওই সমস্ত লোক আল্লাহর ওলী, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ؟ قَالَ :الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(মুসনাদুল বাযযার ১১/২৫১ হা. ৫০৩৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮ হা. ১৬৭৭৯, মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩/৪২ হা. ২৪৩১)

হাদীসটির মান : হাসান বিশাওয়াহিদিহী

চ. আরেক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ তাজা হয়।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ "قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ": الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا، ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى

(মুসনাদে আহমদ ৪৫/৫৭৫ হা.২৭৫৯৯, আল-আদবুল মুফরাদ ১/১১৯ হা.৩২৩, শু'আবুল ঈমান ৯/৭৭ হা. ৬২৮২)

হাদীসটির মান : হাসান

ছ. এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহ স্মরণে আসে, যার কথাবার্তা শুনলে ইলম বৃদ্ধি পায় এবং যার আমল দেখলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ :مَنْ ذَكَّرَكُمُ بِاللَّهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ

(জামেউস সাগীর ২/৮৩০ হা. ৩৯৯৫, কানযুল উম্মাল ১/৪১৯ হা. ১৭৮৬, নাওয়াদিরুল উসূল ১/৫৬৭)

হাদীসটির মান : সহীহ (জামেউস সগীর ২/৮৩০)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

ইমাম সাহেবের নেগরানীতে মহল্লায় তাবলীগের গাশত হওয়া :

যেসব মানুষ দুই ঈদের নামায ব্যতীত অন্য কোনো নামাযে অভ্যস্ত ছিল না বারবার গাশত আর বলা ও শোনার বরকতে নামাযী বনে যায়। মহল্লায় যেসব অফিসার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আছেন, তাঁদের নিকট যাওয়ার সময় নামাযীদের মধ্য থেকে কোনো প্রভাবশালী দাপুটে ব্যক্তি নিজের সাথে অবশ্যই নিয়ে নেবেন। তার কারণে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে কথা শ্রবণ করবেন।

একটি ফ্যাক্টরিতে ইমাম সাহেব বাদ আসর কাউকে সাথে নিয়ে বড় বড় অফিসারদের মধ্যে কারো নিকট অল্প সময় দ্বীনি কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁকে মসজিদে আসার দাওয়াত দিতেন। এভাবে পালাক্রমে বিভিন্ন অফিসারের কাছে যাতায়াত করেছেন। এক বছর পর্যন্ত এভাবে মেহনত করেছেন, ফলশ্রুতিতে অফিসার পর্যায়ের সবাই পাক্কা নামাযী হয়ে গেছেন।

এই দাওয়াত ও গাশতের মেহনতের ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহ.)-এর একটি বাণী মনে পড়ল। "যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে কোনো এলাকাতে দ্বীনি মেহনত করে এবং তাঁর মেহনত ও দাওয়াতের দ্বারা যদি সেখানকার লোকজন দ্বীনদার হয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিকে সেই এলাকার কুতুব বানিয়ে দেওয়া হয়।

মাঝেমধ্যে বাসায় মহিলাদেরকে দ্বীনি কথা শোনানোর ব্যবস্থা করা

মহল্লার মসজিদের ইমাম অথবা কোনো হক্কানী আলেম দ্বারা নিজ বাসায় মাঝেমধ্যে ওয়াজের ইন্তিযাম করা। এতে মহল্লার অন্য মহিলাদেরকেও একত্রিত করা এবং তাদের পর্দার যথাযথ ব্যবস্থা করা।

প্রত্যেক ঘরের মুরব্বি দৈনিক পাঁচ মিনিট অথবা দশ মিনিট দ্বীনের কোনো কিতাব পড়ে শোনানো প্রয়োজন। কিছু সময় ঘরের মহিলা ও শিশুদেরকে পানাহার, ঘুমানো, ঘুম থেকে ওঠা, ওজু, নামায ইত্যাদি বিষয়ে দু-একটি সুন্নাতও শিখানো শুরু করবে।

এভাবে এক বছরে কতগুলো সুন্নাত শেখা হবে। অতঃপর এর ওপর আমলও করাবেন এবং আমলের নেগরানী করতে থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ : শোয়ার সময় প্রথমে ডান পার্শ্বে শোয়া এবং اللهم باسمك اموت واحى দু'আ পড়ে শোয়ার কথা শিখানো।

এভাবে উৎসাহ দেওয়া যে আমাদের নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে শয়ন করতেন। আমরা এভাবে শয়ন করলে আমাদের শোয়াটা নবীওয়ালা শোয়া হবে।

কাফের ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ঘুমায়। পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তি স্বীয় মাহবুব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকায় ঘুমায়। আর এভাবে শয়ন করলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহব্বত করবেন। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে উৎসাহ প্রদান করে তাঁদেরকে শোয়ার সময় এর আমলী মশক করাবেন। এরপরে কিছুদিন পর যখন এই সবক মুখস্থ হয়ে যাবে তখন ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ মুখস্থ করাবেন।

এ সমস্ত শিক্ষার জন্য 'বেহেশতী যেওর', 'তালীমুদ্দীন', কিতাব থেকে সাহায্য নেবেন আর 'হায়াতুল মুসলিমীন' ও পড়ে শোনাবেন। অতঃপর একইভাবে 'জাযাউল আমাল'ও ঘরে পড়ে শোনাবেন। ওই কিতাবে উল্লিখিত গোনাহের ক্ষতিসমূহ ঘরের সবাইকে মুখস্থ করিয়ে দেবেন। স্থানীয় হক্কানী আলেম-উলামার সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করবেন। ইনশাআল্লাহ এভাবে আমাদের ঘরে ঘরে সুন্নাতে নববীর নূর ছড়িয়ে পড়বে। ঘরের সদস্যগণ দ্বীনদার ও নেককার বনে যাবে।

মসজিদের ইমাম-মু'আযযিনদের জন্য উপযুক্ত সম্মানীর ব্যবস্থা করা

বর্তমান অভাবের যুগে যখন একজন পিয়ন আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন অনেক। তার পরও তারা সরকারের কাছে নিজেদের দুরবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ করতেই থাকে। আর মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি বা সেক্রেটারি যাঁদের মাসে অনেক টাকা বেতন বা আয় তাঁদেরও অভিযোগ থাকে অভাবের আর কষ্টের। অথচ তাঁরাই মসজিদের ইমাম আর মু'আযযিনকে খুব সামান্য বেতন দিতে পর্যন্ত অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করেন। অনেকের দৃষ্টিতে ইমাম-মু'আযযিন ও হাফেয সাহেবদের মার্যাদা প্রায় অশিক্ষিতের মতোই। নিজের সন্তানদের ইংরেজি পড়ানোর জন্য স্যার যদি ঘণ্টার জন্য দশ হাজার টাকাও দাবি করেন, তাও মঞ্জুর। অথচ কোরআন মজীদ পড়ানে ওয়ালাকে সামান্য টাকা দিতেও কষ্ট হয়।

আসলে ব্যাপার হলো, দুনিয়ার মুহব্বত ও মর্যাদা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে। আর আখেরাতকে আমরা মামুলি এবং তুচ্ছ বিষয় মনে করি। অথচ দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী ঘর আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী ঘর। সেখানে আরামের জন্য আরো বেশি উদ্যোগী হওয়া তো সুস্থ বিবেকেরও দাবি ছিল।

একটি ঘটনা

জনৈক উজিরের ছেলের সূরা বাকারা খতম হলো। উজির উস্তাদজীকে আড়াই শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন। উস্তাদজী বললেন, এ অংক তো অনেক বেশি। আমি এমন কী করেছি যদ্দরুন আমাকে এত বড় পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। উজির বললেন, আগামীকাল নির্জনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সাক্ষাৎ করার পর উজির বললেন, আপনি আমার ছেলেকে পড়াতে আসবেন না। কেননা আপনার অন্তরে সূরা বাকারার মর্যাদা আমার আড়াই শত মুদ্রার চেয়েও কম। আপনার অন্তরে এই যখন কোরআনকে মূল্যায়নের অবস্থা, তখন আমার ছেলের ওপর আপনার কী প্রভাব পড়বে?

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

গত ১২ এপ্রিল ২০১৫ইং বাদ এশা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর যাওয়ার প্রাক্কালে মারকাযের ছাত্র-শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

অসুস্থতাও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত

এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য বিষয় যে, মানুষের জীবনের গতিবিধি পরিবর্তনশীল, সুখ-শান্তি, দুঃখ-বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা, বিপদ-আপদ মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে বিপরীতমুখী প্রতিটি পরিবর্তন একজন প্রকৃত মু'মিনের জন্য অবশ্যই মহা নেয়ামত, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। একজন মু'মিনের জন্য সুস্থতা যেমন নেয়ামত, অসুস্থতাও একটি নেয়ামত। তবে আমরা দুর্বল বান্দা হিসেবে সুস্থতার নেয়ামতের আর অসুস্থতার নেয়ামতকে সুস্থতার নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করব। তাই তো শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এভাবে দু'আ করতেন–

اے اللہ! صحت بھی تیری نعمت ہے، مرض بھی تیری نعمت ہے، ہم کمزور بندے ہیں، ہمیں صحت کی نعمت عطا کر۔

"হে আল্লাহ! সুস্থতাও তোমার নেয়ামত, অসুস্থতাও তোমার নেয়ামত, আমরা বান্দা হিসেবে কমজুর, দুর্বল। অতএব আমাদেরকে সুস্থতার নেয়ামত দান করুন।"

অসুস্থতা নেয়ামত বোঝার উপায়

সুস্থতা নেয়ামত, এটা তো সবাই বোঝে তবে অসুস্থতাও নেয়ামত, এটা বোঝার উপায় কী? হ্যাঁ, এটাও বোঝার উপায় রয়েছে। যে অসুস্থতা বান্দাকে আল্লাহমুখী করে, সে অসুস্থতাই আল্লাহর নেয়ামত।

আমার অসুস্থতা ও দোস্ত আহবাব

কিছুদিন হলো আমি অসুস্থ, আমার অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে বসুন্ধরাসহ দেশের অসংখ্য মাদরাসায় অগণিত খতমে কোরআন, খতমে বোখারী, খতমে শেফার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইজতেমায়ী ও ইনফেরাদী দু'আ করা হচ্ছে। আবার খতমে জালালীর মতো ব্যয়বহুল খতমেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কিছুই আমার খায়েরখাহ যারা, তারা নিজেদের উদ্যোগেই করে যাচ্ছেন। যেমন একজন মাওলানা সাহেব সম্পূর্ণ নিজের বেতনের টাকা দিয়ে খতমে জালালীর ব্যবস্থা করেছেন, যা একটি বিরল ঘটনা। এ রকমভাবে আরো কিছু দোস্ত নিজেদের গাঁটের টাকা খরচ করে আমার সুস্থতার জন্য খতমে জালালীর ব্যবস্থা করেছেন। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমার ইয়াদতের জন্য সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম আগমন করেছেন এবং আমার সুস্থতার জন্য দু'আ করছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আসা-যাওয়াকে কবুল করুন এবং তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

এসব কিছু দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমার এই অসুস্থতা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নেয়ামত। তবে কমজুর বান্দা হিসেবে আল্লাহর কাছে সুস্থতার নেয়ামত কামনা করি।

সুস্থতা আল্লাহর নেয়ামত

রাসূল (সা.) অসংখ্য হাদীসে সুস্থতাকে নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং উম্মতকে আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করার তা'লীম দিয়েছেন এবং নিজেও সুস্থতা কামনা করতেন। যেমন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত-

ان رجلا جاء الى النبى ﷺ فقال: يارسول الله اى الدعاء افضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والأخرة۔

"জনৈক সাহাবী রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম দু'আ কী? রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্ত সুস্থ জীবন কামনা করো।" (তিরমিযী, হা. ৩৫১২)

হযরত আবু দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

قلت يارسول الله بابى انت وامى لان اعافى فاشكر احب الى من ان ابتلى فاصبر فقال لى رسول الله ﷺ ورسولك معك يحب العافية۔

"তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমি সুস্থ থেকে শুকরিয়া আদায় করাকে অসুস্থ হয়ে ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে বেশি পছন্দ করি। তখন রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.)ও তোমার মতো সুস্থতাকে পছন্দ করেন।" (আততিব্বুন্নববী-আবু নুআইম, হা.১১২)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

ان لله عزوجل عبادا يحييهم فى عافية ويميتهم فى عافية ويبعثهم فى عافية ويدخلهم الجنة فى عافية۔

"কিছু বান্দা এমন আছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুস্থ ও রোগমুক্ত জীবন দান করেন এবং সুস্থ অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। আবার সুস্থ অবস্থায় কেয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং সুস্থ

অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আততিব্বুন্নববী-আবু নুআইম, হা. ১০৮)

দু'আ করেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ ধরনের বিশেষ বান্দাদের কাতারে যেন শামিল করে নেন।

অসুস্থতাও আল্লাহর নেয়ামত

অসুস্থতাও আল্লাহর নেয়ামত। কারণ বান্দা অসুস্থ হলে তার গোনাহ মাফ হয় এবং আখেরাতে মর্যাদার উচ্চাসন লাভ হয়। এ মর্মে অসংখ্য হাদীসে ঘোষণা এসেছে। যেমন রাসূল (সা.) বলেন–

مايصيب العبد من نصب ولا وصب ولاهم ولاحزن ولا اذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها الاكفر الله بها من خطايا ه۔

"মু'মিন যে দুঃখ দুর্দশা, অসুস্থতা, পেরেশানি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, বিষাদ এবং কষ্ট-ক্লেশে ভোগে, এমনকি তার পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয়, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহসমূহকে মাফ করে দেন।" (বোখারী, হা. ৫৬৪২)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

لاتسبى الحمى فانها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد

"তুমি জ্বরকে গালি দিও না। কারণ এই জ্বর আদম সন্তানের গোনাহকে এমনভাবে মুছে দেয়, যেভাবে কামারের হাপর লোহার ঝংকে দূর করে।" (মুসলিম, হা. ২৫৭৫)

আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها ابتلاه الله فى جسده او فى ماله او فى ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التى سبقت له من الله۔

"বান্দার জন্য যখন আল্লাহর তরফ থেকে একটি স্থান বরাদ্দ হয়, যা সে নিজের আমল দ্বারা অর্জন করতে অক্ষম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জানমাল বা সন্তানের দিক দিয়ে বিপদে ফেলেন এবং তার ওপর ধৈর্য ধারণের সামর্থ্য দান করেন। এভাবেই তাকে তার জন্য বরাদ্দকৃত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন।" (আবু দাউদ, হা. ৩০৯০)

হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وعزتى وجلالى لا اخرج احدا من الدنيا اريد اغفرله حتى استوفى كل خطيئة فى عنقه بسقم فى بدنه واقتار فى رزقه

"আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমি যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করি, তাকে অসুস্থতায় ভুগিয়ে এবং অভাব-অনটনে ফেলে তার সব ধরনের গোনাহ ও ভুলভ্রান্তি মাফ করে দিই।" (মিশকাত, হা. ১৫৮০)

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝে আসে, অসুস্থতাও আল্লাহর নেয়ামত, তবে এটা এমন নেয়ামত নয়, যা আল্লাহ তা'আলা থেকে চেয়ে নিতে হবে। বরং চেয়ে নেওয়ার মতো নেয়ামত তো সেটাই, যা স্বয়ং রাসূল (সা.) অধিকাংশ দু'আয় চাইতেন–

اللهم انى اسألك الصحة والعفة الامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر

(আল আদবুল মুফরাদ, হা. ৩০৭)

ইয়াদত-রোগী দেখার ফযীলত

কেউ অসুস্থ হলে তার ইয়াদত করা সুন্নাত। যার ফযীলত কল্পনাতীত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع

"যখন কোনো মুসলমান তার অসুস্থ মুসলিম ভাইয়ের ইয়াদত করার জন্য যায়, তবে সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে।" (মুসলিম, হা. ২৫৬৮)

অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন–

مامن مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى وان عاده عشية الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان لى خريف فى الجنة۔

সকাল বেলা কোনো মুসলমান অন্যত্র একজন অসুস্থ মুসলমান ভাইয়ের ইয়াদত করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশতা রহমতের দু'আ করতে থাকেন। আর সন্ধ্যা বেলা ইয়াদত করলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশতা রহমতের দু'আ করতে থাকেন। অতিরিক্ত তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান বরাদ্দ দেওয়া হয়। (তিরমিযী, হা. ৯৬৯)

আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

من توضأ فاحسن الوضوء وعاد اخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفا۔

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে সওয়াবের আশায় মুসলমান ভাইয়ের ইয়াদত করবে, তবে জাহান্নাম ও তার মাঝে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ, হা. ৩০৯৭)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

من عاد مريضا او زار اخاله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوت من الجنة منزلا۔

"যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ইয়াদত করবে অথবা তার কোনো ভাইকে দেখার জন্য যাবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করেন যে, তুমি ধন্য হয়েছো, ধন্য হয়েছে তোমার পথ চলা। আর জান্নাতে তোমার জন্য একটি মঞ্জিল প্রস্তুত করেছো।" (তিরমিযী, হা. ২০০৮)

পরিশেষে দু'আ করি। আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে যাঁরা ইয়াদতের জন্য এসেছেন আল্লাহ আপনাদেরকে ধন্য করুন। আপনাদের আসাকে ধন্য করুন এবং আমাদের সবাইকে জান্নাত নসীব করুন। একই দু'আ আমি তাঁদের জন্যও করি, যাঁরা আসতে না পারলেও আমার সুস্থতার জন্য দু'আ করেছেন এবং করবেন। আমীন.....

গ্রন্থনা

মুফতী নুর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত (প্রাণীর) ছবি ও ভিডিওর হুকুম

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

গত সংখ্যায় প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের হুকুম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। এ সংখ্যায় ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণ করা ছবি ও ভিডিও সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা হওয়া জরুরি মনে হলো। কেননা ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি ও ভিডিওকে কেউ কেউ জায়েয বলে থাকেন। যার কারণে অনেকেই এ ব্যাপারে সংশয়ে নিপতিত। সংশয় ও সন্দেহ দূর করার জন্যই এ আলোচনার অবতারণা। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হক বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ডিজিটাল ফটোর শরয়ী বিধান

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি এবং ধারণকৃত ভিডিও হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত হয় কি না, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলার, তা সংরক্ষণের এবং পরবর্তীতে স্ক্রিনে প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য সামনে রাখা প্রয়োজন।

এক. ছবি তোলা থেকে সংরক্ষিত হওয়া পর্যন্ত কার্যধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেন,

After the photo is then the image the process by which the image is converted into image data is known as scanning the image. At first is scanned totally by the moving image sensor after scanning the linear scanner apply the image into three byers of different colours (red, blue and green) which perfectly adgust the colours with the scanned image to turn a perfect image data.

অর্থাৎ ছবিটি তোলার পর লেন্সের সাহায্যে ছবিটি ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ছবিটি ইমেজ সেন্সরের মাধ্যমে স্ক্যানিং পদ্ধতিতে হুবহু আরেকটি ছবি তৈরি করে। সেই ছবিটিকে Linear sensor তার তিন স্তরের (লাল, নীল এবং সবুজ) রঙের সাহায্যে হুবহু আসল ছবিটির সাথে অ্যাডজাস্ট করে ইমেজ ডাটায় পরিণত করে।

উল্লেখ্য, যে সেন্সরের সাহায্যে ছবিটি ইমেজ ডাটায় পরিণত হয়, সে সেন্সরকে ইমেজ সেন্সর বলে।

দুই. ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি ইমেজ ডাটার সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত অবস্থায় ছবির আকৃতি সংরক্ষিত থাকে না; বরং যখন স্ক্রিনে প্রকাশ করা হয় তখন শুরুতে যেই আকৃতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেই আকৃতিতে প্রকাশ পায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (টক) ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ফিজিক্সের প্রফেসর Ordwell Smith বলেন,

All types of digital cameras store photos with the help of image data.

সব ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা তাদের তোলা ছবি ইমেজ ডাটার সাহায্যে মেমোরি ডিস্ক ইত্যাদির মধ্যে জমা রাখে।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কম্পিউটার লাহোরের জনাব তাফসীর আহমদ বলেন,

ویڈیو کیمرے یا ڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کی گئی شبیہ طبیعی یا ظاہری اعتبار سے شبیہ نہیں ہوتی۔

অর্থ : ভিডিও ক্যামেরা বা ডিজিটাল ক্যামেরায় সংরক্ষিত ছবি বাহ্যিক এবং প্রকৃতিগতভাবে চিত্র না। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১০৮)

তিন. ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা সংরক্ষিত ছবিটি যখন টিভি স্ক্রিন কিংবা কম্পিউটার মনিটরে ছবির আকৃতিতে প্রকাশ পায়, তখন ছবিটি Dots/Pixols এর সমষ্টি দ্বারা ছবির রূপ ধারণ করে। ম্যাগনেটের সাহায্যে ইলেকট্রিক সিগন্যালের মাধ্যমে অসংখ্য রশ্মি

ফোঁটার ইলেকট্রিক খণ্ডাংশের সমষ্টিই হলো এ ছবি। এ আলোকরশ্মি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে নতুন অসংখ্য আলোকরশ্মির উদ্ভব ঘটে। এভাবে ছবিটি জীবন্ত হয়ে দৃষ্টিতে আসে।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি নিষিদ্ধ ছবি হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত

অ্যানালগ ক্যামেরার ছবি আর ডিজিটাল ক্যামেরার ছবির মধ্যে গঠনমূলক দিক থেকে মূলত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির Pr. John Philip বলেন,

Huge changes have took place from the first to now a days digital cameras.

'অ্যানালগ ক্যামেরা থেকে শুরু করে ডিজিটাল ক্যামেরা পর্যন্ত বিশাল পরিবর্তন এসেছে।'

এ পরিবর্তনের কারণেই অ্যানালগ ক্যামেরায় ছবি তোলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ সামান্য হলেও

মুফতী রফী উসমানী বলেন,

ان هذه الاشكال والمشاهد ليست بعكس بعينه الا انها تشارك العكس فى كون كل واحد منهما مشتملا على الاجزاء الاشعاعية، فبناء على ذلك رجحنا القول بكون هذه الاشكال اشبه بالعكس من كونه اشبه بصور الحقيقة المحرمة.

অর্থ : এ সকল চিত্র এবং দৃশ্য হুবহু ছায়া নয়। তবে রশ্মি-খণ্ডাংশপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে ছায়ার সাথে মিল আছে। এই ভিত্তিতে এই চিত্র প্রকৃত হারাম ছবি থেকে ছায়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। (আলমাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ ২/১৬৪)

১৪০৬ হি. সনে জারীকৃত দারুল উলূম করাচির একটি ফতওয়া এখানে তুলে ধরা হলো, যাতে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.-এর স্বাক্ষর রয়েছে।

البتہ اگر ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام بفرض محال مذکورہ بالا محرمات اور دیگر تمام مفاسد ومنکرات سے خالی ہو اور نہایت پاکیزہ ہو تو ان کے جواز میں درج ذیل تفصیل ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ٹی وی کے پروگرام تین قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) واقعات کی مصور فلم ٹی وی پر دکھلائی جائے۔

(۲) واقعات اور پروگرام براہ راست نشر ہوتے ہیں۔

(۳) واقعات کی غیر مصور فلم رکارڈ کی طرح پہلے تیار کر لیتے ہیں جس میں آواز کے ساتھ کچھ غیر مرئی نقوش بھی ٹیپ ہو جارہے ہیں۔ پھر حسب موقع اس کو لگاتے ہیں جس میں سے آواز کی طرح تصاویر بھی آجاتی ہیں۔

ان میں سے پہلی صورت میں جو کچھ دکھلایا جاتا ہے خواہ کتنا ہی پاکیزہ، مذہبی اور تعلیمی نوعیت کا پروگرام وہ بلا شبہ تصویر ہے، جاندار کی تصویر

الشاشة، وانما هى اجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا الى الشاشة ...ثم تفتى وتزول ...، اما اذا احتفظ بالصورة فى شريطة الفيديو، فان الصور لاتنقش على الشريط وانما تحفظ فيها الاجزاء الكهربائية التى ليس فيها صورة ...الخ

অর্থ : আমার (এ ধরনের ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারে) সংশয় রয়েছে। তার কারণ, হারাম ছবি হলো যা চিত্রিত কিংবা খোদাইকৃত হয়। স্থায়িত্বের গুণে গুণান্বিত হয়। বরং এ ধরনের ছবি তো শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির চেয়ে ছায়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়...। কারণ এ ছবি ক্যামেরাতেও স্থিত না, পর্দায়ও না। এটা তো কেবল ইলেকট্রিক খণ্ডাংশ ক্যামেরা থেকে স্ক্রিনে আসে...। নিঃশেষ হয় আবার অস্তিত্বে আসে। আর যখন ভিডিও ক্যামেরায় সংরক্ষণ করা হয় তখন ছবিটি কোনো ফিতায় চিত্রিত হয় না। চিত্রিত হয় হলো ইলেকট্রিক খণ্ডাংশে, যা চিত্র নয়। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৯৮)

মুফতী রফী উসমানী বলেন, ছবি না হওয়ার কারণ হলো, প্রকৃত ছবি তখনই বলা যায়, যদি তা চিত্রিত বা খোদিত কিংবা অঙ্কিত হয় এবং তার মধ্যে استقرار বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া পাওয়া যায়। (আল মাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২/১৬২)

শাইখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক বলেন,

وهذه الصورة تنقل الى ذبذبات كهربية مغناطيسية تطبع على شرطة التسجيل ليس بشكل صورة وانما بشكل اشارات ضوئية كهربية

এই ছবি ইলেকট্রিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়, সংরক্ষণের স্থানে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ছবির আকৃতিতে নয়; বরং ইলেকট্রিক আলোক সিগন্যালের আকৃতিতে। (হুকমুত তাসবীর; পৃষ্ঠা ১৫ [শামেলা সংস্করণ])

ডিজিটাল ক্যামেরার ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা আরো বেশি দেখা গেছে। নিম্নে আমরা উভয় মতের বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ডিজিটাল ছবি হারাম হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতের বিভিন্নতা হারাম হওয়ার কার্যকারণ নির্ধারণে মতপার্থক্যের কারণে হয়েছে। যাঁরা ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা এবং এ ছবি হারাম না হওয়ার কথা বলেন; তাঁদের দৃষ্টিতে ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি শরয়ী পরিভাষায় যাকে 'তাসবীর' বলা হয়েছে তার সংজ্ঞায় পড়ে না এবং এতে পারিভাষিক ছবি হওয়ার মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত,

(এক). ليس لها ثبات واستقرار এ ধরনের ক্যামেরায় তোলা ছবির কোনো স্থিরতা এবং স্থিতিশীলতা নেই।

(দুই). ليست منقوشه على شىء بصفة دائمة স্থায়ীভাবে কোনো কিছুতে অঙ্কিত এবং চিত্রিত হয় না।

(তিন). فان الصور لاتنقش على الشريط وانما تحفظ فيها الاجزاء الكهربائية التى ليس فيها صورة

ডিজিটাল চিত্র ফিতায় চিত্রিত হয় না; বরং তাতে ইলেকট্রিক খণ্ডাংশ সংরক্ষিত হয়, যাতে কোনো সূরত থাকে না।

ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,

فان لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه، فيه وقفة، وذلك لان الصورة المحرمة ما كانت منقوشة اومنحوتة بحيث يصح لها صفة الاستقرار على شىء بصفة دائمة، فانها بالظل اشبه منها بالصورة، ويبدو ان الصورة التلفزيون والفيديو لاتستقر على شىء فى مرحلة من المراحل الا اذا كان فى صورة فيلم، فان كانت صورة الانسان حية بحيث تبدو على الشاشة فى نفس الوقت الذى يظهر فيه الانسان امام الكاميرا ...فان الصورة لاتستقر على الكاميرا ولاعلى

چونکہ اس وقت بغیر سطح اور مسالہ کے عکس تو محفوظ کرنے اور باقی رکھنے کی شکل پیدا نہیں ہوتی تھی، اس لئے سطح اور مسالہ کے ذریعہ بقاء کی قید تھی، یہ قید قید واقعی ہے، قید احترازی نہیں۔

অর্থ : যেহেতু তখন নেগেটিভ ও মসলা ছাড়া ছায়াকে সংরক্ষণ করা এবং স্থির রাখা যেত না, তাই তখন নেগেটিভ ও মসলার মাধ্যমে ছায়াকে বাকি রাখার শর্ত করা হয়েছিল। এটা 'কয়দে ইত্তেফাকী' 'কয়দে এহতেরাযী' নয়।

সুতরাং যে ছবি সংশ্লিষ্ট সত্তার অনুগামী; স্বতন্ত্র নয়, তা হারাম হবে না। যেমন আয়না বা পানিতে প্রকাশ পাওয়া ছবি। আলোর কারণে যে ছায়া হয় তা। এসব যেহেতু সংশ্লিষ্ট সত্তার অনুগামী, তাই তা হারাম নয়। ছবি হারাম হওয়ার বর্ণিত কারণের স্বপক্ষে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো,

(এক) মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী "عکس" এবং ফটোর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এভাবে,

سب سے بڑا فرق دونوں میں یہی ہے کہ آئینہ وغیرہ کا عکس پائیدار نہیں ہوتا، اور فوٹو کا عکس مسالہ لگا کر قائم کرلیا جاتا ہے، پس وہ اسی وقت عکس ہے، جب تک مسالہ سے اسے قائم نہ کیا جائے اور جب اسکو کسی طریقہ سے قائم اور پائیدار کرلیا جائے وہی تصویر بن جاتا ہے۔

সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, আয়না বা এ-জাতীয় জিনিসের প্রতিবিম্ব সংরক্ষিত এবং স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় না। কিন্তু ফটোর ছায়া কেমিক্যাল লাগিয়ে স্থায়ী এবং স্বতন্ত্র করা হয়। সুতরাং তা ততক্ষণ عکس যতক্ষণ কেমিক্যাল লাগিয়ে স্থায়ী করা না হয়। আর যখন তা কোনোভাবে স্থায়িত্ব এবং দেখানো হয় তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাসবীর বলতে দ্বিধা হয়। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১২৪)

দরসে তিরমিযীতে আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন,

تیسری قسم وہ ہے جو ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ دکھائی جاتی ہے میرے نزدیک اسکو بھی تصویر کہنا مشکل ہے۔

অর্থ : তৃতীয় প্রকার হলো, যা ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষণ করে স্ক্রিনে প্রকাশ করা হয়... আমার দৃষ্টিতে এ ছবিকে নিষিদ্ধ ছবি বলা মুশকিল। (দরসে তিরমিযী, ৫/৩৫২)

যাঁরা ডিজিটাল ছবি হারাম মনে করেন তাঁদের দৃষ্টিতে এ ধরনের ছবি হারাম হওয়ার কারণ

যে সকল উলামায়ে কেরাম ডিজিটাল ছবি হারাম মনে করেন তাঁদের দৃষ্টিতে ছবি হারাম হওয়ার ভিত্তি হলো, সেটি স্বতন্ত্র হওয়া, যার ছবি তার অনুগামী না হওয়া। চাই তা কোনো পৃষ্ঠে বা হার্ডকপিতে চিহ্নিত হোক বা সফটকপিতে সংরক্ষিত হোক। অ্যানালগ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হোক কিংবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে (সংখ্যা নির্ভর পদ্ধতিতে)। ছবিটি যার তার আকৃতিতেই যদি পুনর্বার প্রকাশ করার সক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তবে এমন ছবিকে হারাম ছবিই বলা হবে। যেভাবেই সংরক্ষণ করা হোক, যেভাবেই প্রকাশ পাক। ছবির استقرار এবং স্থিরতা ও স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এতটুকুই। পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের কারো ফাতওয়ায় কেমিক্যাল লাগিয়ে استقرار করার যে কথা বলা হয়েছে তা قیداتفاقی ;احترازی না। মাযাহেরে উলূম-এর ফাতওয়া, যার ওপর দেওবন্দের মুফতীয়ানে কেরামও স্বাক্ষর করেছেন, তাতে বলা হয়েছে,

دیکھنا دکھلانا حرام ہے اس میں متحرک اور غیر متحرک تصاویر کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ جس طرح جاندار کی تصاویر بنانا حرام ہے اسی طرح بلا عذر بالقصد اور بالارادہ انکو دیکھنا بھی حرام ہے جیسا کہ عبارت ذیل سے واضح ہے۔

البتہ دوسری اور تیسری صورت میں جو کچھ دکھلایا جاتا ہے اسکو قطعی طور پر تصویر کہنے میں تامل ہے۔

অর্থ : যদি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে টেলিভিশনের কোনো প্রোগ্রাম পূর্বোক্ত হারাম এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে মুক্ত ধরেও নেওয়া (যদিও তা অসম্ভব) হয়, সম্পূর্ণ গোনাহমুক্ত হয়, তবে এর বৈধতার ব্যাপারে সামনের বিশ্লেষণ দেখা হবে। তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা গেছে টিভির প্রোগ্রাম তিন ধরনের,

(১) চিত্রিত ফিল্ম টিভিতে দেখানো হয়।

(২) কোনো অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

(৩) কোনো প্রোগ্রাম চিত্রিত করা ছাড়া ফিল্মে ধারণ করা হয়, যার মধ্যে আওয়াজের সাথে কিছু غیرمرئی (দৃশ্যমান নয় এমন) নুকুশও ধারণ হয়। এরপর সময়মতো তা চালু করা হয়। এতে আওয়াজের সাথে সাথে ছবিও দৃশ্যমান হয়।

এর মধ্য থেকে প্রথম সূরতে যা দেখানো হয়, তা যতই নিষিদ্ধ কাজমুক্ত হোক, ধর্মীয় কিংবা শিক্ষাবিষয়ক প্রোগ্রাম হলেও সেটা নিঃসন্দেহে শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবি। প্রাণীর ছবি দেখা এবং দেখানো উভয়টিই হারাম। এতে চলমান কিংবা স্থির হওয়ার ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য হয় না। কারণ যেমনিভাবে প্রাণীর ছবি বানানো হারাম, তদ্রূপ প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃত তা দেখাও হারাম।

তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারে যা

ہے، پس جب تک وہ ظل ہے اس کے احکام ہیں، اور جب اس کو برقرار کرلیا جائے تو وہ صورت بن جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ (تحفۃ الالمعی ۵/۸۰)

অর্থ : অনেকে বলে, ডিজিটাল ক্যামেরার ছবি পানিতে পড়া ছায়ার মতো, যা ক্যামেরার মাধ্যমে ধরে রাখা হয় এবং স্বাতন্ত্র্য রূপ দেওয়া হয়, আর ছায়াকে ধরে রাখার মধ্যে এমন কী সমস্যা আছে? এ কথার উত্তর হলো, ছবি চাই ছায়ার মাধ্যমে নেওয়া হোক বা অন্য কোনো উপায়ে নেওয়া হোক সর্বাবস্থায় তা ফেতনা ছড়ায়। অতএব, ছায়া যতক্ষণ ছায়া থাকবে, ততক্ষণ তার ওপর ছায়ার হুকুমই বর্তাবে আর যখন সেটাকে স্থির করে নিয়ে স্বাতন্ত্র্য রূপ দান করা হবে, তখন সেটা হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এ বিষয় পরিষ্কারভাবে সামনে এসে গেছে যে, প্রাণীর ছবি যদি স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করে এবং যে প্রাণীর ছায়া তার অনুগামীমুক্ত হয়ে যায়, মূলের অনুপস্থিতিতে তা দেখা সম্ভবপর হয়, তবে এমন ছবি হারাম ছবিই হবে। চাই তা কোনো নেগেটিভে সংরক্ষিত হোক কিংবা ইলেকট্রিক সিগন্যাল/ইমেজ ডাটার আকৃতিতে সংরক্ষিত হোক।

নিকট অতীতের সকল উলামায়ে কেরাম ডিজিটাল ক্যামেরার ছবিকে হারাম বলেছেন। তাঁদের কয়েকজনের উদ্ধৃতি–

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী বলেন,

ویڈیو کیمرہ سے کسی بھی تقریب کی منظر کشی کا عمل تصویر سازی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے، جیسے قدیم زمانہ میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، پھر کیمرہ کی ایجاد نے اس قدیم طریقہ میں ترقی کی اور تصویر ہاتھ کے بجائے مشین سے بننے لگی، جو زیادہ سہل اور دیرپا

অনুগমনমুক্ত হয়ে যায়, তা ছবি হয়ে যায়। (ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৮৪)

মুফতী শফী (রহ.) আলাতে জাদীদাহ কে আহকাম পৃষ্ঠা ১৪২-এ লেখেন,

حاصل یہ ہے کہ عکس جب تک مسالہ وغیرہ کے ذریعہ سے پائیدار نہ کرلیا جائے، اس وقت تک عکس ہے، اور جب کسی طریقہ سے قائم و پائیدار کرلیا جائے تو وہ تصویر بن جاتا ہے، اور عکس جب تک عکس ہے، نہ شرعا اس میں کوئی حرمت ہے اور نہ کسی قسم کی کراہت، خواہ آئینہ پانی یا کسی شفاف چیز پر ہو یا فوٹو کے شیشہ پر، اور جب وہ اپنی حد سے گذر کر تصویر کی صورت اختیار کریگا، خواہ وہ مسالہ کے ذریعہ سے ہو یا خطوط ونقوش کے ذریعہ سے، اور

خواہ یہ فوٹو کے شیشہ پر ہو یا آئینہ وغیرہ شفاف چیزوں پر، اس کے سارے احکام وہی ہوں گے جو تصویر کے متعلق ہیں۔

সারকথা হলো, প্রতিচিত্র বা ছায়া যতক্ষণ কেমিক্যাল ইত্যাদি দ্বারা স্থিরতা লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ছায়া। আর যখন কোনোভাবে স্থির এবং স্বতন্ত্র হয়ে যায় তখন তাসবীর হয়ে যায় (ছায়া থাকে না)। আর ছায়া যতক্ষণ ছায়া, না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোনো হুরমত থাকে, না কোনো কারাহাত। চাই আয়না, পানি বা পরিচ্ছন্ন কিছুতে হোক। কিংবা ক্যামেরার সিসায় হোক। আর ছায়া যখন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছেড়ে তাসবীরের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে পড়ে, চাই তা কেমিক্যালের মাধ্যমে তাসবীরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হোক বা নকশার মাধ্যমে অথবা তা ফটোর সিসায় হোক বা আয়না ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন জিনিসের মধ্যে। তো তাসবীরের যত বিধান রয়েছে সব এ ছবির সাথে সম্পর্কিত হবে।

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

اسکو عکس کہنا بھی صحیح نہیں، اس لئے کہ عکس اصل کے تابع ہوتا ہے اور یہاں اصل کی موت کے بعد بھی اسکی تصویر باقی رہتی ہے۔

অর্থ : এ ধরনের ছবিকে عکس বলা অনুচিত। কারণ ছায়া তো মূলের অনুগামী হয়। এ ক্ষেত্রে যার ছবি তার মৃত্যুর পরও তার ছবি বাকি থাকে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৮৯)

অপর স্থানে বলেন, তাসবীর এবং عکس এ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জিনিস। তাসবীর হলো কোনো জিনিসের স্থিত এবং সংরক্ষিত নকশা। عکس অস্থির এবং সাময়িক নকশা হয়, যার ছায়া সে সটকে পড়লে তার সেই ছায়াও অদৃশ্য হয়ে যায়। ভিডিও এর ফিতায় তাসবীর হয়, যখন চায়, যতবার চায়, টিভি স্ক্রিনে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ছবি মূলের অনুগামী না বরং তার থেকে সম্পর্কমুক্ত এবং স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

কত লোক এখন দুনিয়ায় যার নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। কিন্তু তার দিব্যি চলমান ছবি ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষিত, এমন ছবিকে কেউ "عکس" বলতে পারে না। শুধু এইটুকু বিষয়কে কেন্দ্র করে যে, ভিডিওর ফিতায় কোনো ছবি দেখা যায় না, তাসবীরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভুল।

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. শরহে তিরমিযীতে বলেন,

اسی طرح یہ دلیل کہ کیمرہ کا فوٹو ایک ظل سایہ ہے اور خود اسکا سایہ نہیں ہے، جیسا کہ پانی میں سایہ پڑتا ہے، بس اس کو کیمرہ سے برقرار کرلیا، پس اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ظل برقرار کرنے ہی سے تو صورت بنتی ہے، اور صورت کا سایہ ہونا ضروری نہیں، اور مطلق صورت سے فساد پھیلتا

"موجات الكترونية "تفريق بوصف ملغى لا اعتبار لها فى الشرع لان الشرع علق الحكم على وصف المضاهاة ، فهو الوصف المؤثر فى الحكم، اما طريقة مضاهاة الصورة فهو وصف طردى لم يتعرض له الشارع.

অর্থ : কোরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হারাম ছবি আর বর্তমানের ছবির মাঝে এ কথার ভিত্তিতে পার্থক্য বর্ণনা করা যে, এ ছবি হলো 'ইলেকট্রিক তরঙ্গ' অনর্থক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে পার্থক্য করা। এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা শরীয়তে নেই। (নাফাইসুল ফিকহ ৪/৩২০)

মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کو عکس قرار دینا صحیح نہیں، عکس وہ صورت ہے جس میں ٹھہراؤ اور جماؤ نہ ہو، جیسا کہ پانی یا آئینہ میں ہوتا ہے۔ ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی میں یہ صورت نہیں ہوتی، بلکہ صاحب تصویر کی صورت ریل میں محفوظ ہو جاتی ہے اور جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

অর্থ : ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফিকে ছায়া বলা ঠিক নয়। কারণ عكس বা ছায়া বলা হয়, যে ছবির স্থিরতা এবং স্বতন্ত্রতা না হয়, যেমনটি পানি বা আয়নায় হয়। ভিডিওগ্রাফি কিংবা ফটোগ্রাফিতে এই অবস্থা হয় না; বরং যার ছবি তার আকৃতি Reel এ সংরক্ষিত হয়। স্বতন্ত্র এবং স্থিরকৃত হয়ে যায়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১৮০)

সায়েন্সি গবেষণার ভিত্তিতে ডিজিটাল ছবিকে তাসবীর না বলা প্রসঙ্গে

সায়েন্সি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ডিজিটাল ফটোকে তাসবীর না বলা ঠিক না। বরং তাসবীরের শরয়ী হুকুমের ভিত্তি জনসাধারণের ধারণা এবং তার বাহ্যিক অবস্থার ওপর হওয়া উচিত।

সংরক্ষিত ছবি টিভিতে দেখা সম্ভব। এ ধরনের ছবিকে হারাম ছবিবহির্ভূত বলা যায় না। বেশির থেকে বেশি বলা যায় যে, হাতে ছবি বানানোর পুরনো নিয়মের পরিবর্তে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছবি বানানোর এক সূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শরীয়তপ্রণেতা যখন প্রাণীর ছবি হারাম বলেছেন, তো ছবি বানানোর যেমন পদ্ধতিই আবিষ্কার হোক, ছবি বানানো হারামই হবে। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১২৬)

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. বলেন,

اسی طرح ایک دلیل لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ ڈیجیٹل میں اور فلم میں غیر واضح ذرات کی شکل میں تصویر آتی ہے، پس اس پر تصویر کا اطلاق درست نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ غیر واضح نکتے کیا کام آئیں گے؟ ان کو بہر حال صحفۂ قرطاس (اسکرین) واضح کر کے منتقل کیا جائیگا، پس مآلا وہ تصویر بنیں گے، اس لئے ابتداء ہی سے وہ حرام ہوں گے۔

অর্থ : এক দলিল এই দেওয়া হয় যে, ডিজিটাল ক্যামেরায় এবং ফিল্মে Dots এর আকৃতিতে ছবি আসে। সুতরাং এমন ছবিকে হারাম ছবি বলা ঠিক না। কীন্তু ভাবার বিষয় হলো, এই غيـــر واضـــح দৃশ্য Dots এর কী স্বার্থকতা! এই ছবি তো স্ক্রিনে প্রকাশ করাই মূল উদ্দেশ্য। এটা তো শেষ পর্যন্ত তাসবীরই (হারাম ছবি) হবে। এ জন্য শুরু থেকেই তা হারাম ধরা হবে। (তুহফাতুল আলমাঈ ৫/৮০)

মিশরী আলেম শাইখ আবূ যর কালমুনী তাঁর লিখিত فتنة تصوير العلماء والظهور এর ৪৬ পৃষ্ঠায় فى القنوات الغضائية লেখেন,

ان التفريق بين الصور التى ورد تحريمها فى النصوص وبين هذه الصور بان هذه

ہوتی ہے، اب اس عمل میں نئی نئی سائنسی ایجادات نے مزید ترقی کی اور جدت پیدا کی، اور جامد وساکن تصویر کی طرح اب چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی صورت کو بھی محفوظ کیا جانے لگا، یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کو قرار وبقاء نہیں۔

অর্থ : ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা যেকোনো অনুষ্ঠান ধারণ করার কাজ ছবি তৈরির অত্যাধুনিক পদ্ধতি। যেমন অতীতে একসময় ছবি হাতে বানানো হতো। পরে ক্যামেরা আবিষ্কারের মাধ্যমে সেই পদ্ধতির আধুনিকায়ন হয়েছে। ফলে ছবি হাতের পরিবর্তে মেশিনে তৈরি হতে লাগল, যা বেশি সহজ; বহু দিন ভালো থাকে। এখন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এই কাজে আরো উন্নতি করেছে এবং নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। স্থির, নিষ্প্রাণ ছবির মতো এখন চলমান, ধাবমান ছবিও সংরক্ষণ করা যায়। এ ধরনের ছবির ক্ষেত্রে এ কথা বলা সঠিক নয় যে, এর কোনো স্থিরতা এবং স্বাতন্ত্র্য নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৮৮)

মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানবী-এর ফাতওয়া,

ٹی وی اور ویڈیو فلم کا کیمرہ جو تصویریں لیتا ہے وہ اگرچہ غیر مرئی ہیں لیکن تصویر بہر حال محفوظ ہے، اور اس کو ٹی وی پر دیکھا جا سکتا ہے، اس کو تصویر کے حکم سے خارج نہیں کیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کا فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترقی نے تصویر سازی کا ایک دقیق طریقہ ایجاد کیا ہے، لیکن جب شارع نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا خواہ کیسا ہی طریقہ ایجاد کر لیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔

অর্থ : টিভি এবং ভিডিও ফিল্মের ক্যামেরায় যে ছবি তোলা হয় তা যদিও দৃশ্যমান না, কিন্তু ছবি সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত (দেখা যাক বা না যাক)। এই

মাযাহিরে উলূমের ফাতওয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে,

کسی بھی مسئلہ کی سائنسی تحقیق کرنا برا نہیں، ڈیجیٹل چپ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کی اہل فن سے تحقیق کی جا سکتی ہے، لیکن اس تحقیق پر فتوی کا مدار رکھنا مناسب نہیں، فتوی کا مدار اس شیء کے عوامی تصور اور اس کی ظاہری حیثیت پر ہی ہونا چاہیئے۔

অর্থ : কোনো জিনিসের সায়েন্সি গবেষণা অন্যায় নয়। ডিজিটাল মেমোরি কিভাবে কাজ করে? তা বিশেষজ্ঞ থেকে যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু ফাতওয়ার ভিত্তি এর ওপর রাখা ঠিক নয়। ফাতওয়ার ভিত্তি সাধারণের ধারণা এবং সে জিনিসের বাহ্যিক অবস্থার ওপর হওয়া উচিত। (চান্দ আহাম আসরী মাসায়িল; পৃষ্ঠা ৩৫২)

মুফতী শফী (রহ.) মাইক ব্যবহারের আলোচনায় সায়েন্সি গবেষণার শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

عام احکام اسلامیہ کے ملاحظہ سے یہ امر متیقن ہے کہ جن مسائل کا تعلق فلسفیانہ تحقیق وتدقیق یا ریاضی کی باریکیوں یا اصطرلاب وغیرہ آلات سے ہے،

شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ان سب میں حقائق کی تحقیق وتدقیق سے اغماض کر کے محض ظواہر پر احکام دائر فرمائے ہیں، جن کو ہر خاص وعام عالم وجاہل شہری اور جنگلی آسانی کے ساتھ بدون استعانت آلات وحسابات معلوم کر کے خدا تعالی کی طرف سے عائدشدہ فریضہ سے سبکدوش ہو سکے۔

অর্থ : ইসলামী বিধিবিধানের গবেষণা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে সামনে এসে গেছে যে, যে সকল মাসায়িলের সম্পর্ক দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার সূক্ষ্মতাসংশ্লিষ্ট কোনো মাধ্যমের সাথে, ইসলামী শরীয়ত এ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম গবেষণা পরিহার করে শুধু বাহ্যিক অবস্থার ওপর হুকুম প্রয়োগ করেছে। যেটা বিশেষ, সাধারণ আলেম, অজ্ঞ এবং শহরবাসী-গ্রামবাসী সকলেই সহজে বুঝতে পারে। কোনো প্রকার যন্ত্র, মাধ্যম কিংবা হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজন না পড়ে।

এরপর বলেন,

مذکور الصدر اصول کے مطابق آلۂ مکبر الصوت کے ذریعہ سنائی دینے والی آواز کو ظاہر ومتعارف عوام کے موافق متکلم کی اصل آواز ہی کہا جائیگا، گوفنی تدقیقات بالفرض یہی ثابت کریں کہ وہ اصل آواز نہیں، بلکہ اس کا عکس ہے، کیوں کہ اس صورت میں اصل آواز اور اس آلہ کی آواز کا فرق اس قدر دقیق ہوگا کہ اس کو عوام تو کیا خود ماہرین سائنس کو واضح نہ ہوا۔

অর্থ : বর্ণিত নীতির আলোকে মাইকের আওয়াজের ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট যেই ভাবনা পরিচিত সে অনুযায়ী মাইকের আওয়াজকে বক্তার আওয়াজই বলা হবে। যদিও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা এটা প্রমাণ করে যে, এই আওয়াজ প্রতিধ্বনি। কারণ এ ক্ষেত্রে মূল আওয়াজ আর প্রতিধ্বনির পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে, এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে অক্ষম। (আলাতে জাদীদা কে আহকাম; পৃষ্ঠা ৬০)

তা ছাড়া কতক গবেষকের দৃষ্টিতে এ ধরনের ছবি সায়েন্সি দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিই। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কম্পিউটার লাহোরের জনাব তাফসীর আহমদ বলেন,

ویڈیو کیمرہ یا ڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کی گئی شبیہ طبعی یا ظاہری اعتبار سے شبیہ نہیں ہوتی لیکن معنوی اعتبار سے وہ شبیہ ہی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب شبیہ کے اظہار کا مرحلہ آئے گا تو وہ اسی شبیہ کی شکل میں ظاہر ہوگی کہ جیسے ابتداء میں محفوظ کیا گیا تھا، نہ کہ کسی اور صورت میں، لہذا مخصوص سائنسی اصطلاح میں بھی رموز(Codes)) میں پوشیدہ اس شبیہ کو"شبیہ "ہی کہا جائیگا۔

অর্থ : ভিডিও ক্যামেরা অথবা ডিজিটাল ক্যামেরাতে সংরক্ষিত চিত্র বাহ্যিক এবং প্রকৃতিগতভাবে চিত্র হয় না। তবে ফলাফলের দিক থেকে তা ছবিই। অর্থাৎ যখন চিত্র প্রকাশের পর্ব আসে তো এই ছবি ওই চিত্রের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে, যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল; অন্য কোনো আকৃতিতে নয়। সুতরাং একান্ত সায়েন্সি পরিভাষায়ও Codes এর আকারে ধারণকৃত এই চিত্রকে ছবিই বলা হবে। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮)

স্ক্রিনে ডিজিটাল ছবি প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বমান এবং নিঃশেষ হওয়া প্রসঙ্গ

এ ব্যাপারে আমরা শুধু মুফতী রশীদ আহমদ (রহ.)-এর ফাতওয়া তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ (ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی تصویر) مٹ جاتی ہے اور پھر بنتی ہے یہی عمل ہر لحظہ جاری رہتا ہے تو اس میں اور زیادہ قباحت ہے کہ بار بار تصویر بنانے کا گناہ ہوتا ہے۔

অর্থ : যদি এ কথাই বলা হয় যে, টিভি স্ক্রিনে প্রকাশ হওয়া তাসবীর মিটে যায় এরপর আবার অস্তিত্বমান হয়। এভাবে প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বমান এবং অস্তিত্বহীন হতে থাকে তবে তো এতে আরো বেশি মন্দত্ব প্রকাশ পায় যে, বারবার ছবি বানানোর গোনাহ হতে থাকে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৯৮)

দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরে উলূমের ফাতওয়া

মাযাহিরে উলূম থেকে জারীকৃত এবং দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতিয়ানে কেরাম কর্তৃক সত্যায়িত দীর্ঘ ফাতওয়ায় একপর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

الغرض مذکورہ معروضات کی روشنی میں ڈیجیٹل نظام کے ذریعہ محفوظ کردہ عکس اور ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی صورتیں بھی تصویر محرم میں داخل ہیں اور مجسم تصویر سازی اور فوٹو گرافی کی طرح ناجائز اور حرام ہیں۔

অর্থ : ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ছবি এবং টিভি স্ক্রিনে প্রকাশ পাওয়া চিত্রও হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত; প্রতিকৃতি তৈরি এবং ফটোগ্রাফির মতো নাজায়েয এবং হারাম। (চন্দ আহাম আসরী মাসায়িল; পৃষ্ঠা ৩৫৭)

এতে মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরীসহ দেওবন্দ এবং মাযাহিরে উলূমের ছয়জন মুফতী স্বাক্ষর করেন। এ ছাড়া উপমহাদেশের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া এমনই।

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ

১. অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে প্রাণীর ডিজিটাল ছবি শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তস্বীকৃত প্রয়োজন ছাড়া তা ধারণ করা ও ব্যবহার করা হারাম। এ মর্মে তাঁদের বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং অধিক প্রামাণ্য।

২. শরীয়তের স্বীকৃত নীতি হলো, হালাল-হারাম কিংবা বৈধ-অবৈধের মধ্যে বিরোধ হলে হারাম হওয়াটাই অগ্রাধিকার পায়। কারণ এতে অধিক সতর্কতা।

৩. যারা প্রাণীর ডিজিটাল ছবিকে নিষিদ্ধ ছবি বলেননি তাঁরা হারাম ছবি না হওয়ার কথা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক ও দ্ব্যর্থহীন শব্দে বলেননি। এ ব্যাপারে তাঁদের শব্দ প্রয়োগ সংশয়ের দিকটি পরিষ্কার ফুটিয়ে তোলে। যেমন, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. এক স্থানে বলেছেন, فیہ وقفۃ (এ ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৯৮) দারুল উলূম করাচির ফাতওয়ায় বলা হয়েছে, اسکو قطعی طور پر تصویر کہنے میں تأمل ہے (অর্থ) প্রাণীর ডিজিটাল ছবিকে অকাট্যভাবে হারাম ছবি বলতে দ্বিধা আছে।

অন্যদিকে যাঁরা ডিজিটাল ছবিকে শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবি বলেছেন তাঁরা এ কথা সিদ্ধান্তমূলক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন।

উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে আমাদের দৃষ্টিতে ডিজিটাল ছবি হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত। বিনা প্রয়োজনে এ ধরনের ছবি তোলা বা ভিডিও করা এবং তার দর্শন-প্রদর্শন হারাম। হ্যাঁ, যে ধরনের প্রয়োজনে মুদ্রিত ছবি ধারণ ও ব্যবহার বৈধ হয় ডিজিটাল ছবির ক্ষেত্রেও সে ধরনের প্রয়োজন স্বীকৃত হলে প্রয়োজন অনুপাতে তার অবকাশ থাকবে।

উল্লেখ্য, যেসব যুক্তির ভিত্তিতে মুফতী তকী উসমানী দা.বা. ডিজিটাল ছবিকে হারাম বলতে দ্বিধা করেন যদিও এখানে সংশ্লিষ্টভাবে সেসব যুক্তির খণ্ডন হয়ে গেছে তবুও যদি কেউ সবিস্তার জানতে চান তাহলে মুফতী শুআইবুল্লাহ খান কর্তৃক রচিত 'নাফায়েসুল ফিকহ' (৪/৩১০) নামক গ্রন্থ দেখে নিতে পারেন।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৬

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

পূর্বনির্ধারিত প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিভিত্তিক কারেন্সি নোটের লেনদেন

আমদানি-রপ্তানিকারকদের জন্য এলসি এবং আমদানি-রপ্তানি চুক্তির অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা কভার দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। এই সুযোগ প্রদানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা বর্তমান সময়ে মুহূর্তে মুহূর্তে মুদ্রা মূল্যের মধ্যে উত্থান-পতন সংঘটিত হয়ে থাকে। এই অস্থিতিশীল অবস্থায় আমদানি-রপ্তানিকারকদের জন্য তাদের লাভ-লোকসানের অনুমান করা এবং নিজেকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচানো ও ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যার ফলে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা কভারের সুযোগ দিয়ে থাকে, যাতে ভবিষ্যতে ডলারের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্ষতি না হয়। উল্লেখ্য, আমদানিকারকদেরকে তাদের আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হয় সর্বদা ডলারের হিসাবে। যার জন্য ডলার ক্রয় করা বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে এর মাধ্যমে রপ্তানিকারক তার রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য উসুল করে, যদ্বারা সে দেশীয় মুদ্রা ক্রয় করে থাকে।

ফরওয়ার্ড কভার কন্ট্রাক্ট (Forward Cover Contract)

বর্তমান সুদি ব্যবস্থায় আমদানি-রপ্তানিকারকগণ এলসি খোলার পর ভিনদেশি মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনো ব্যাংকের সাথে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে Forward Cover Contract করতে পারে।

১. উক্ত কন্ট্রাক্টের সময় কমপক্ষে এক মাস হতে হবে।

২. যদি এক মাসের আগে পরিশোধ করতে হয় তাহলে যেদিন পরিশোধ করতে হবে ওই দিনের স্পট (Spot) অর্থাৎ ইন্টার ব্যাংক রেট হিসাবে পরিশোধ করা যাবে।

ফরওয়ার্ড কভার কন্ট্রাক্ট নির্ধারিত তারিখে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সমাপ্ত করা যাবে।

ফরওয়ার্ড কভার কন্ট্রাক্টের প্রচলিত পদ্ধতি নিম্নে পেশ করা হলো :

১. আমদানিকারকের জন্য আজ থেকে নব্বই দিন পরে রপ্তানিকারককে এক মিলিয়ন ডলার আদায় করতে হবে। আমদানিকারক যেহেতু জানে না নব্বই দিন পরে এক ডলার = কত টাকা হবে, যার ওপর ভিত্তি করে সে তার বাজেট পরিকল্পনা করতে পারে, সেহেতু আমদানিকারক কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাথে ফরওয়ার্ড কভার কন্ট্রাক্টের জন্য যোগাযোগ করে যার পদ্ধতি অনেকটা এ ধরনের হয়–

২. ধরা যাক ডলারের স্পট (Spot) অর্থাৎ ইন্টার ব্যাংক মূল্য ৬০ টাকা।

৩. কমার্শিয়াল ব্যাংক যথা–ন্যাশনাল ব্যাংক এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার আজকের দিনে ৬০ টাকা হিসাবে মার্কেট থেকে ক্রয় করল এবং তাৎক্ষণিকভাবে সে জনতা ব্যাংকের নিকট ৬০ টাকা ধরে বিক্রি করে দিল এবং এর সাথে একটা চুক্তি হলো যে, এক মাস পরে ডলারের মূল্য যাই হোক, ন্যাশনাল ব্যাংক জনতা ব্যাংক থেকে ৬১ টাকা হিসাবে ডলার ক্রয় করবে।

৪. ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতি ডলার দশ পয়সা হিসেবে নিজের ফিস উক্ত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত করে আমদানিকারকের নিকট প্রতি ডলার ৬১.১০ পয়সা হিসাবে আজ থেকে নব্বই দিন পরে এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার বিক্রি করার ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়।

৫. এমতাবস্থায় দুটি পদ্ধতি :

ক. আমদানিকারক ন্যাশনাল ব্যাংককে ৬১.১ মিলিয়ন টাকা আদায় করবে এবং ন্যাশনাল ব্যাংক .১ টাকা নিজের ফিসের টাকা রেখে দেবে এবং ৬১ মিলিয়ন টাকা জনতা ব্যাংককে আদায় করে এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার হাসিল করবে। যার মাধ্যমে ন্যাশনাল ব্যাংক তার ক্রেতা আমদানিকারককে আদায় করবে। এমতাবস্থায় এই আকদটা/চুক্তিটা পূর্বের শর্তানুসারে বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।

খ. নব্বই দিন পূর্বে আমদানিকারক ন্যাশনাল ব্যাংককে অবহিত করবে যে, কন্ট্রাক্ট বাতিল হওয়ার ফলে সে ডলার ক্রয় করতে পারবে না। সুতরাং সে ব্যাংকের সাথে কৃত আকদটার সমাপ্তি ঘটাতে চায়। কেননা যদি সে ডলার রাখতে চায় তাহলে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে কন্ট্রাক্ট ব্যতীত ডলার রাখার অনুমতি নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন মতে, আমদানিকারক উক্ত ডলার বুকিং রেট অর্থাৎ প্রতি ডলার ৬১.১ টাকা হিসাবে ক্রয় করে তাৎক্ষণিক ন্যাশনাল ব্যাংকের নিকট বাজারদর অথবা চুক্তির দিনের বাজার মূল্য উভয়টার মধ্যে যেটাই কম হবে, ওই মূল্যের ওপর পুনঃ ন্যাশনাল ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে দিতে বাধ্য থাকবে।

পূর্বোক্ত উদাহরণে ডলারের মূল্য চুক্তির দিন ধরা হয়েছে ৬০ টাকা। ধরে নেওয়া যাক যে চুক্তির বিশ দিন পরে কন্ট্রাক্ট বাতিল হচ্ছে অথচ ওই দিন ডলারের মূল্য ৬১ টাকায় বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়

ন্যাশনাল ব্যাংক আমদানিকারক থেকে ৬০ টাকা হিসাবে ডলার পুনঃ ক্রয় করবে। এতে আমদানিকারককে এক মিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে, যা জরিমানা হিসেবে আদায় করার নামান্তর।

এটা হলো বৈদেশিক মুদ্রা কভার করার সুদভিত্তিক ও কনভেনশনাল পদ্ধতি, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।

শরীয়া সম্মত পদ্ধতি

এর শরীয়া বিকল্প হলো এই, এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার আমদানিকারকের আজ থেকে নব্বই দিন পরে আদায় করতে হবে তাই সে এর জন্য কোনো একটি ইসলামী ব্যাংক উদাহরণস্বরূপ আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের সাথে ফরওয়ার্ড কভার কন্ট্রাক্টের জন্য যোগাযোগ করে।

১. ধরে নেওয়া যাক ডলারের স্পট (Spot) মূল্য ৬০ টাকা।

২. আল-আরাফাহ্ ব্যাংক অন্য একটি ইসলামী ব্যাংকের যেমন ধরুন শাহ্জালাল ব্যাংকের সাথে এইটা চুক্তি সম্পাদন করে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদারূপে, এইভাবে যে, তিন মাস পর আল-আরাফাহ্ ব্যাংক শাহ্জালাল ব্যাংক থেকে ৬১ টাকা হিসাবে ডলার ক্রয় করবে, উক্ত দ্বিপাক্ষিক ওয়াদার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ তিন মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হবে। চুক্তি অনুসারে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক, শাহ্জালাল ব্যাংক থেকে তিন মাস পরে ক্রয়ের ওপর আকদ করবে এবং ৬১ মিলিয়ন টাকার বিনিময়ে এক মিলিয়ন ডলার নেবে। শাহ্জালাল ব্যাংক এক মিলিয়ন ডলার আজকের তারিখে বাজার থেকে ক্রয় করে নিজের স্টকে রেখে দেবে, যাতে তিন মাস পরে সে তার ক্রেতা আল-আরাফাহ্ ব্যাংককে সরবরাহ করতে পারে।

৩. আল-আরাফাহ্ ব্যাংক প্রতি ডলারে ১০ পয়সা হিসাবে নিজের লভ্যাংশ এতে অন্তর্ভুক্ত করে আমদানিকারক থেকে ৬১ টাকা হিসাবে আজ থেকে ৯০ দিন পরে বিক্রি করার ওপর দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা করে নেবে।

উক্ত চুক্তি অনুসারে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে তিন মাস পরে বিক্রয় চুক্তি করবে এবং ৬১.১০ মিলিয়ন টাকার বিনিময়ে ১ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার দেবে।

এ পর্যায়ে ওই দুইটি পদ্ধতি হতে পারে, যেই পদ্ধতিদ্বয় পূর্বে ক ও খ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) পদ্ধতিটা তো স্পষ্ট তবে (খ) এর পদ্ধতিতে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে যে চুক্তি করেছে তা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সম্পাদন হতে পারে।

১. আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের সাথে ফরওয়ার্ড কভার কন্ট্রাক্ট করবে এর ওপর যে শাহ্জালাল ব্যাংক থেকে ৯০ দিন পরে আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের যেই ডলার ক্রয় করতে হবে, যেগুলো এখন আমদানিকারকের প্রয়োজন নেই ওই ডলারগুলো ইসলামী ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে দেবে। ধরে নেওয়া যাক, এই কন্ট্রাক্ট আল-আরাফাহ্ ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ৫৯ টাকা দরে হলো।

২. চুক্তি লঙ্ঘন করলে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক আমদানিকারক থেকে নিজের ক্ষতির পরিমাণ উসুল করে নেবে। উপরোক্ত উদাহরণে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক আমদানিকারক থেকে প্রতি ডলারে ২ টাকা করে নিয়ে নেবে অর্থাৎ ৬১-৫৯=২।

৩. নব্বই দিন পরে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক, শাহ্জালাল ব্যাংক থেকে প্রতি ডলার ৬১ টাকা হিসাবে নিয়ে নেবে এবং ৫৯ টাকা হিসাবে ইসলামী ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে দেবে।

প্রথম পদ্ধতিতে যা প্রচলিত রয়েছে এতে বিক্রয়টা হয় ভবিষ্যৎ হিসাবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয এবং এতে 'বাঈ ঈনা'-এর সমস্যাও বিরাজমান। তাই এ থেকে বাঁচার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যাতে বাঈ ঈনার সমস্যাও নেই, আবার বাঈ-এর সম্পর্কটা ভবিষ্যৎকালের সাথেও নয়। বরং শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা হয়।

ভবিষ্যৎকালের বাঈ তথা (Forword Sale) তো শরীয়তে সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয।

দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা শরীয়তসম্পত কি না?

প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা জায়েয হবে কি না? অর্থাৎ দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা বিচারিক পর্যায়ে উভয় পক্ষের ওপর পূরণ করা বাধ্যতামূলক কি না? এতে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

প্রথম মত : দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা, বিচারিকভাবে পালনীয় নয়। ইসলামী ফিকহ একাডেমি জিদ্দা তাদের পঞ্চম মিটিংয়ে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হলো, ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটা মত ও বক্তব্য, যাতে ইমাম মালেক (রহ.) ওই সব আকদ এবং লেনদেনসমূহ, যা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদন করা যায় না ওইগুলোর ওপর দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা করাকেও নাজায়েয বলেছেন। যথা, খাদ্যদ্রব্যাদি কবজ করার পূর্বে এর বিক্রি করা তাঁর মতে অবৈধ, তাই উক্ত আকদের ওপর দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাও করা যাবে না। তবে এ বিষয়ে ইমাম মালেক (রহ.)-এর আরো দুটি বক্তব্য রয়েছে। যার মধ্যে একটি বক্তব্য হলো, এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা মাকরূহ এবং দ্বিতীয় বক্তব্য অনুসারে জায়েয। যথা ইযাহুল মাসালিকে উল্লেখ রয়েছে,

القاعدة الخامسة والستون: الاصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه فى الحال حماية۔

ومن ثم منع مالك المواعدة فى العدة وعلى بيع الطعام قبل قبضه ووقت نداء الجمعة وعلى ماليس عندك ۔ وفى

الصـرف مشهورهـا المنع وثالثها الكـراهة وشهـرت ايضـا لجوازه فى الحال وشبهت بعقد فيه تأخير وفسرت به المدونة۔ (ايضاح المسالك ٢٧٦)

وفى القوانين الفقهية:

الفرع الخامس يكره الوعد فى الصرف على المشهور وقيل يجوز وقيل يمنع۔ (القوانين الفقهية الجزى المالكى ١٦٦)

ইসলামী ফিকহ একাডেমী জিদ্দার সিদ্ধান্তও নিম্নে পেশ করা হলো–

قرارات مجمع الفقه الاسلامى:

ثالثا: المواعدة وهى التى تصدر من الطرفين تجوز فى بيع المرابحة بشرط الخيار المتواعدين كليهما او احدهما فاذا لم يكن هناك خيار فانها لاتجوز ، لان المواعدة الملزمة فى بيع المرابحة تشبه البيع بنفسه، حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة نهى النبى ﷺ عن بيع الانسان ماليس عنده۔ (قرارات ، قرار رقم ٤١/٤ جدة)

বাহরাইনভিত্তিক هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الاسلامية এর শরীয়া পরিষদও এই মতটা গ্রহণ করেছে।

لايجوز ان تشتمل وثيقة الوعد او مافى حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين (الموسسة والعميل) لانها تشبه حينئذ عقود البيع نفسه قبل التملك (٢/٣)

يجوز اصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء اذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او احدهما۔ (المتطلبات الشرعية لصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، بحرين ١٦)

শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ রয়েছে–

تحرم المواعدة فى المتاجرة فى العملات اذا كانت ملزمة للطرفين ولوكان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة اما الوعد من طرف واحد فيجوز ولوكان ملزما۔

শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে–

تحريم المواعدة الملزمة فى مبادلة العملات هو ماعليه جمهور الفقهاء لان المواعدة الملزمة من طرفى المبادلة تشبه العقد الخ۔

যে সকল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ উপকরণের উপস্থিতির কারণে এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়, সে সকল ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সাথে সাদৃশ্যতার কারণে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা করাও বৈধ হবে না।

আলোচ্য বিষয়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে যেহেতু بيع ماليس عندك তথা মালিকানা পূর্ব বিক্রয়, بيع قبل القبض করায়ত্বপূর্ব বিক্রয়ের মতো শরীয়ত নিষিদ্ধ উপকরণের উপস্থিতির কারণে এ চুক্তি অবৈধ বলে বিবেচিত। তারই সাথে সাদৃশ্যতার কারণে এ ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদ চুক্তিও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় মত ও বক্তব্য

দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে প্রয়োজনের তাগাদায় উভয় পক্ষের ওপর বিচারিকভাবে অনিবার্য পালনীয় করা যেতে পারে। এই মতটা হলো হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের। তাঁদের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো–

فتاوى خانية على هامش الهندية

وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لان المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس۔ (الفتاوى الخانية على هامش العالمكيرية ١٦٥/٢)

وفى شرح المجلة للاتاسى:

وان ذكر البيع من غير شرط ثم الشرط على وجه المواعدة فالبيع جائز ويلزم الوفاء بالوعد لان المواعيد قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس--- وقال بعد اسطر : وان ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازما لحاجة الناس اليه۔ (شرح المجلة للاتاسى ٤١٥/١)

وفى تطور النقود:

الصورة الخامسة : هى المواعدة على الصرف وذلك بان يتفق العميل مع المصرف على ان يشترى منه بعد شهر مثلا نقدا بالآخر كالدولار بالاسترلينى او بالريال، فاذا حل الاجل المضروب للصرف ابرما عقد الصرف بينهما وتقاضابالسعر الحاضر۔ ويلجأ التجار عادة الى هذه الصورة لاستخدامها فى عمليات الاستيراد والتصدير حتى يضمنوا تجهيز العملة الاجنبية اللازمة للوفاء بالتزاماتهم المستقبلة۔ وحكم هذه الصورة: الصحة لوجود حقيقة الصرف وشرطه والمواعدة السابقة جائزة لاشئ فيها عند اكثر العلماء وممن نص على هذا الشافعى رحمه الله حيث قال: واذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس ان يشترى الرجلان الفضة ثم يقرانهاعند احدهما حتى يتبايعاها ويصنعابها ماشاء ، كما نص على ذلك ابن حزم فقال: والتواعد فى بيع الذهب بالذهب او بالفضة وفى بيع الفضة بالفضة وفى سائر الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك اولم يتبعايعا لانه لم يأت نهى عن شئ من ذلك--- ولا دليل لبعض المالكية على كراهة هذه المواعدة او فسادها۔ (تطور النقود ١٤٨)

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সারমর্ম হলো, দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা কোনো কোনো সময় যথার্থ ও সহীহ হয় এবং বিচারিক পর্যায়ে বাধ্যগতভাবে পালনীয়ও হয়। এই মতামতটা আল্লামা ফতেহ মুহাম্মদ লাখনভী (রহ.)ও পছন্দ করেছেন। (ই'তরুল হিদায়া, পৃ. ২৪৩-২৪৫)

বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা.বা.-এর মতামতও তাই। তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনার প্রাক্কালে লেখেন–

وان عبارة قاضى خان رحمه الله بصفة خاصة صريحة فى ان المواعدة يمكن ان تجعل لازمة عند الحنفية لحاجة الناس ، والمواعدة انما تكون من الطرفين فتبين انه لابأس بجعلها لازمة عند الحنفية لحاجة الناس، ولاشك ان الحاجة فى الزام المواعدة ظاهرة الخ۔ (عقود التوريد والمناقصة ٤)

অর্থাৎ, কাযীখানের বক্তব্য একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে মানুষের প্রয়োজনের তাগাদায় হানাফী মাযহাবে অনিবার্য পালনীয় সাব্যস্ত করা যেতে পারে। "মুওয়াআদা" দুই পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এটাতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হানাফী মাযহাব মতে মানুষের প্রয়োজনে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট।

পর্যালোচনা ও প্রাধান্য

উপরোল্লিখিত বক্তব্যদ্বয়ের মধ্য থেকে আমাদের নিকট দ্বিতীয় মতটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কেননা আলোচ্য মাসআলাটা ইজতিহাদি মাসআলা, যা সরাসরি নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই সময়ের তাকাদা হলো, "মুওয়াআদা" বা দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে বিচারিকভাবে অনিবার্য সাব্যস্ত করা। কিন্তু শর্ত হলো, এই অনিবার্যকরণ কেবলমাত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হতে হবে। অর্থাৎ যদি ওয়াদা পূরণ না করে, বরং ভঙ্গ করে তাহলে কোনো এক পক্ষের ক্ষতি হবে। এটাই প্রয়োজন।

প্রথম পক্ষ যেসব দলিল পেশ করেছে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাটা ভবিষ্যৎযুক্ত আকদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। এবং এমন এক জিনিসের ওয়াদাকরণ হবে, যা ওয়াদার সময় হাতে নেই। এই দলিলটা তেমন নির্ভরযোগ্য দলিল নয়। কেননা ওয়াদা এবং আকদের মধ্যে বিধান, হুকুম ও পরিণতির দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হলো, দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা বাস্তবে কোনো ফাইনাল আকদ হয় না, বরং সেটা হয় একটা নির্ধারিত সময়ে আকদ সম্পাদিত হওয়ার ওপর ওয়াদামাত্র। সুতরাং ওয়াদাকারী উভয় পক্ষকেই নির্ধারিত তারিখ ও সময় আসলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে যথরীতি আকদের প্রস্তাব ও সমর্থন উভয়টা করতে হবে। আকদ তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হওয়া এবং শুধুমাত্র আকদের ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, যে ব্যক্তি কোনো জিনিস ক্রয়ের আকদ করল তখন "মুবী" অর্থাৎ বিক্রিত পণ্য তৎক্ষণাৎ ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। যদি বাঈ সালাম হয় তাহলে মুবী বিক্রেতার দায়িত্বে ঋণ হয়ে যায়। সুতরাং দায়দায়িত্ব স্থানান্তরিত হওয়া ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তাব ও সমর্থনের তৎক্ষণাৎ পরেই হবে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি একটি ঘর ক্রয় করে এবং ঘরের মূল্য এখনো বিক্রেতাকে হস্তান্তর করেনি তাহলে ওই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিক্রেতার জন্য ঋণী হয়ে যাবে। এমনকি এর ওপর ঋণী ব্যক্তির সব বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে বিধায় উক্ত ঋণ সমপরিমাণ যাকাতের দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে তাকে অন্য ঋণীদের মতো মনে করা হবে। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি গম বিক্রয় করল তাহলে ওই ব্যক্তি ওই পরিমাণ গমের ঋণী হয়ে গেল বিক্রেতার জন্য। সুতরাং তার ওপরও ওই পরিমাণের যাকাতের দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা কারো ওপরও ঋণ হয় না এবং এর ওপর উল্লিখিত কোনো প্রভাব বিস্তৃত না হওয়াটা স্পষ্ট। বরং উল্লিখিত পরিণতি ও প্রভাব বিস্তৃত হবে ওই সময়, যখন ওয়াদাকারী উভয়ে নির্ধারিত সময় ও তারিখ আসার পর প্রস্তাব ও সমর্থনের (ইজাব ও কবুল) মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিটা সম্পন্ন করবে। এর পূর্বে কেবল ওয়াদার ভিত্তিতে ওই ধরনের কোনো বিধিবিধান এতে প্রয়োগ হবে না।

দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে বিচারিক পর্যায়ে অনিবার্য পালনীয় করলে এর কী প্রভাব পড়বে?

দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাকে বিচারিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করার পরিণতি হবে এই–

১. বিচারক উভয় পক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ে আকদ করা এবং তা বাস্তবায়নের ওপর বাধ্য করবে। এ ব্যাপারে কারো অস্বীকৃতিজ্ঞাপন জায়েয হবে না।

২. যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ ওয়াদাপূরণে অস্বীকৃতি জানায়, যার ফলে অপরপক্ষ বাস্তবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল, তাহলে এমতাবস্থায় বিচারক বা হাকিম তাকে সংঘটিত বাস্তব ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায়ে বাধ্য করবে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

لاضرر ولاضرار فى الاسلام (الدراية فى تخريج احاديث الهداية ٢/٢٨٢)

অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অবকাশ নেই। তাই প্রমাণিত হলো মুদ্রার হাতবদল প্রাধান্যপ্রাপ্ত বক্তব্য ও মতানুসারে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা পদ্ধতিতে জায়েয হবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

"এক মুহূর্ত ফিকির করা ৬০ বছর ইবাদত হতে উত্তম"

এটি হাদীস

মুফতী আব্দুস সালাম নো'মানী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ الْمَلَطِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً(العظمة لابى الشيخ ابن حيان الاصفهانى ١/٢٩٩ رقم الحديث ٤٣)

"এক মুহূর্ত ফিকির করা ৬০ বছর ইবাদত হতে উত্তম।"

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) তাঁর স্বীয় কিতাব ফাজায়েলে যিকিরে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মাসিক আল-আবরারের ফেব্রুয়ারি-২০১৫ সংখ্যায় 'ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন' ধারাবাহিক কলামে হাদীসটির তাখরীজ ও সংক্ষিপ্ত হুকুম পেশ করা হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সাময়িকীতে গত এপ্রিল-২০১৫ সংখ্যায় উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে "এটি হাদীস নয়" শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো :

১। এটি হাদীস।

২। হাদীসটির সনদের মান যে পর্যায়েরই হোক না কেন, প্রায় মুহাদ্দিস ও মুফাসসীরগণ এটিকে হাদীস বলেই উল্লেখ করেছেন। তবে আরব বিশ্বের একজন তথাকথিত হাদীস বিশারদ, হাদীসবিদ্বেষী বিতর্কিত ব্যক্তি নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে মওজু বলেছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস এটিকে মওজু বলেননি।

৪। হাদীস শরীফে এসেছে–

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (صحيح البخارى ١/٣٣ رقم ١٠٧)

যদি আলোচ্য হাদীসটি হাদীস না হয়ে থাকে তাহলে কি প্রবন্ধকার শায়খুল হাদীস (রহ.)সহ আরো যত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির এটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাদেরকে উল্লিখিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন (?) এটি কি আকাবিরদের প্রতি চরম অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ নয়?

তদুপরি যেখানে উল্লেখযোগ্য অনেক মুহাদ্দিসীন এই হাদীসটিকে হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন, প্রবন্ধকার কেন 'এটি হাদীস নয়' বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে গেলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

বিভ্রান্তি নিরসনে হাদীসটির আরো সংক্ষিপ্ত তাহকীক, সাথে হাদীসশাস্ত্রের কিছু নিয়ম কানুন তুলে ধরা হলো।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে হাদীসের মতন হলো–

فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة

(দেখুন, কিতাবুল আজমাহ ১/২৯৯, হা. ৪৩)

হাফেজ ইরাকী হাদীসটির সনদের ওপর যঈফ হওয়ার হুকুম লাগিয়েছেন। (দেখুন, আলমুগনী ৪/৩৬৮)

হাফেজ মুরতাজা যুবাইদী হাফেজ ইরাকী (রহ.)-এর সহমত পোষণ করেছেন, যা তাঁর নীরবতা থেকে প্রতীয়মান হয়। (দেখুন, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ১৩/৩০৫)

হাফেজ সুয়ূতী (রহ.) যঈফ বলেছেন। (দেখুন, আল-জামিউস সাগীর, হা. ৫৮৯৭, আললাআলিল মসনুআহ ২/৩২৭)

হাফেজ ইবনুল জাওযী বলেন–

هذاحديث لا يصح

উল্লেখ্য যে, موضوع এবং لايصح এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন হাফেজ বদরুদ্দী যারকাশী (রহ.) বলেন–

بين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون كبير فان الوضع اثبات الكذب والاختلاق وقولنا لايصح لايلزم منه اثبات العدم، وانما هو اخبار عن عدم الثبوت وفرق بين الامرين

(দেখুন, আননুকাত-যারকাশী ২/২৮২-২৮৩)

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, হাদীসের হুকুমের ক্ষেত্রে হাফেজ ইবনুল জওযী (রহ.)-এর তাশাদ্দুদ ও অতিরঞ্জিত করার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন–

وقد اكثر جامع الموضوعات فى نحو مجلدين اعنى ابا الفرج ابن الجوزى فذكر كثيرا ممالا دليل على وضعه بل هو ضعيف

(দেখুন, আততাকরীব ১/২৪৯)

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন–

ذكر فى كتابه الحديث المنكر والضعيف الذى يحتمل فى الترغيب والترهيب وقليلا من الاحاديث الحسان--- واما من مطلق الضعف ففيه كثير من الاحاديث

(দেখুন, আল ইফসাহ-ইবনে হাজর, পৃ. ৩৬৩)

এ ছাড়া হাদীস বিশারদগণের মতে, কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই করা ছাড়া শুধুমাত্র ইবনুল জওযী (রহ.)-এর

মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো হাদীসের ওপর হুকুম আরোপ করা যাবে না।

হাফেজ সাখাবী (রহ.) বলেন–

وهو توسع منكر ينساعنه غاية الضرر من ظن ماليس بموضوع، بل هو صحيح موضوعا، مما يقلده فيه العارف تحسينا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره

(দেখুন, ফতহুল মুগীস ১/২৯৭)

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয় যে, হাদীসশাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী তখনই কোনো হাদীসের ওপর সনদের দিক থেকে মওজু হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে, যখন তা كذاب ও وضاع রাবীর تفرد হবে। অর্থাৎ তার متابع বা شاهد না থাকে।

ইবনু আবি হাতিম (রহ.) (ইন্তিকাল ৩২৭ হি.) বলেন–

يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وان يكون كلاما يصلح ان يكون من كلام النبوة ويعلم سقمه وانكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته

(দেখুন, আল জারহু ওয়াত তাদীল ১/৩৫৯)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) বলেন–

---ابن الصلاح فى كتابه علوم الحديث قال: ويعرف الوضع باقرار واضعه او ما ينتزل منزلة الاقرار، وبر كاكة لفظه ومعناه وزاد غيره : بان ينفرد به راوكذاب عندهم ولا يوجد ذلك الحديث عندغيره---

(আননাকদুস সারীহ ১২, আরো দেখুন, ফাতহুল মুগীস ১/২৯৭)

তাই নয়, শুধুমাত্র كذاب বা وضاع রাবীর তাফাররুদের ভিত্তিতেও কোনো হাদীসের ওপর মওজু হওয়ার হুকুম আরোপ করা হাদীস বিশারদগণের অনুসৃত নীতি নয়। (দেখুন, আননুকাত যারকানী ২/২৬৫, ফাতহুল মুগীস ১/২৯৭)

এবার দেখা যাক, উপরোল্লিখিত হাদীসটি দুজন বিতর্কিত রাবীর তাফাররুদ নাকি তাদের شاهد ও আছে? কিতাব অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, হাফেজ ইরাকী (রহ.) হাদীসটিকে যঈফ বলে এর شاهد উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, আলমুগনী ৪/৩৬৮) আর এই মতটিকে সমর্থন করেছেন হাফেজ সুয়ূতী, ইবনে আররাক, আল ফাতানীর মতো হাদীস বিশারদগণ। (দেখুন, যথাক্রমে আল্লাআলিল মাসনূআ ২/২৭৬, তানযীহুশশরীয়াহ ২/৩০৫, তাযকিরাতুল মাওজুআত ১৮৮)

তা ছাড়া হাদীসটিকে আল জামিউস সাগীরে উল্লেখ করার অর্থই হলো এর شاهد আছে। কারণ উক্ত কিতাবের লেখক ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলেছেন, এ صننته عما تفرد به وضاع او كذاب কিতাবটিকে كذاب বা وضاع এর তাফাররুদাত থেকে মুক্ত রেখেছি।

হাদীসের شواهد গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

تفكر ساعة فى اختلاف الليل والنهار خير من عبادة الف سنة

(দেখুন, মুসনাদে দাইলামী ২/৪৬, আললাআলী মসনুআ ২/২৭৬)

২। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

تفكر سَاعَة فِى اخْتِلَاف اللَّيْل وَالنَّهَار خير من عبَادَة ثَمَانِينَ سنة

হাফেজ ইরাকী (রহ.) বলেন, اسناده ضعيف جدا۔ (মুসনাদুল ফিরদাউস লিদ দাইলামী, হা. ২৩৯৭)

৩। হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تفكر ساعة خير من قيام ليلة۔

(দেখুন, আযযুহদ-আহমদ, হা. ৭৪৬, আযযুহদ-হান্নাদ ২/৪৬৮, শু'আবুল ঈমান-বায়হাকী, হা. ১১৭, হিলয়াতুল আওলিয়া-আবু নুআইম ১/৩০৮, আযযুহদ-ইবনুল মুবারক, হা. ৯৪৯, তারিখে ইবনে আসাকির ৪৭/১৫০)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

تفكر ساعة خير من قيام الليل

(আল আজমাহ-আবুশ শায়খ ১/২৯৭)

৫। হাসান বসরী (রহ.) বলেন–

تفكر ساعة خير من قيام ليلة

(দেখুন, আযযুহদ-আহমদ, হা. ১৫৪৭, হিলয়াতুল আওলিয়া-আবু নুআইম ৬/২৭১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা. ৩৫২২৩)

৬. আমর ইবনে কায়েস বলেন–

بلغنى ان تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر

(দেখুন, আল আজমা আবুশশায়খ ১/৩০৫ হা. ৪৮)

৭। সারীর আসসাকাতী (রহ.) বলেন,

تفكر ساعة خير من عبادة سنة

এটির ব্যাপারে মোল্লা আলী (রহ.) বলেন, ليس بحديث তবে আল্লামা আল ফাকাহানী (রহ.) বলেন, এটি সাররী আসসাকাফীর উক্তি।

(দেখুন.... কাশফুল খফা আজলুনী ১/৩৫৭, হা. ১০০৪)

موقوف হাদীসও مرفوع হতে পারে

হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের যেসব উক্তি غير مدرك بالقياس সেগুলোও হুকুমের দিক থেকে مرفوع বলে বিবেচিত। (নুযহাতুন নাযার– ইবনে হাজার [রহ.] ৭৬,৭৭)

আর সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও কর্মকাণ্ড হাদীসের সংজ্ঞার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা সর্বজন বিধিত। (মারিফাতু উলিমিল হাদীস লিল হাকেম ১৯) অতএব আলোচ্য হাদীসকে 'হাদীস নয়' বলা হাদীসের মূলনীতি অনুসারে সঠিক নয়।

কওমী মাদরাসা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য বনাম বাস্তবতা

মাওলানা শরীফ উসমানী

কওমী মাদরাসাগুলোকে ভয়ংকর বিপজ্জনক (টেরিবলি ডেঞ্জারাস) আখ্যায়িত করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শেরে বাংলানগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিদের সঙ্গে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। (সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ : শেষ পৃষ্ঠা, ৮/৪/২০১৫ ইং)। অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের বিষয়ে আমাদের মূল্যায়ন শব্দবদ্ধ করার পূর্বে আমরা কওমী মাদরাসা শব্দদ্বয়ের অর্থ, পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই। 'কওম' শব্দটি আরবী। এর অর্থ গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, সম্প্রদায় ও জনগণ। কওমী শব্দের প্রধান অর্থ জাতীয় (বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ২০৫; 'কওম') মাদরাসাও আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, অধ্যায়নের স্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যাপীঠ। বাংলা একাডেমীর বাংলা অভিধান মতে, মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রকে মাদরাসা বলা হয়। (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৯৭৫, 'মাদ্রাসা')। সুতরাং কওমী মাদরাসা মানে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেহেতু কওমী মাদরাসাগুলো সরকারি অনুদানের পরিবর্তে মুসলিম জাতির অর্থানুকূলে জনসাধারণের কল্যাণে পরিচালিত হয়, তাই এ ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কওমী মাদরাসা বলা হয়।

কওমী মাদরাসা কী ও কেন?

কওমী মাদরাসা একটি আদর্শ, একটি দৃষ্টান্ত, একটি দর্শন, একটি আন্দোলন, একটি বিপ্লব, একটি ইতিহাস। কওমী মাদরাসা হক ও হক্কানিয়্যাতের হুজ্জাত। দ্বীন ও ধর্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ। কওমী মাদরাসা নবুওয়াতের জ্যোতি ও ঈমানের দ্যুতির মশালবাহী একটি ধর্মীয় গবেষণাগার। সর্বপ্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরাপদ স্থান মসজিদে, 'মসজিদে নববীতে'। নাম ছিল ছুফফা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এমন এক মহামানব, যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বজগতের প্রতি করুণার বিমূর্তপ্রতীক করে। তিনি বিশ্বনবী প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মাত্র তেইশ বছরে তিনি যে যুগান্তকারী শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, পৃথিবীর ইতিহাস তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়েছে। জীবনব্যাপী ত্যাগ, সাধনা, কুরবানী ও শ্রমের মাধ্যমে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন সাহাবায়ে কেরামের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একটি জামা'আত। যাঁরা ছিলেন হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, সৎ, সুন্দর ও মহত্তের ধ্রুবতারা। তাঁদের পথ ধরেই গড়ে উঠেছে তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, মুজাদ্দিদীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও সালফে সালেহীনের প্রজন্ম পরম্পরায় আকাবিরে উম্মতের সুযোগ্য সুমহান একটি কাফেলা। তাঁদেরই পথ, মত ও পদাঙ্ক অনুসরণকারী এক মহান ব্যক্তি হলেন ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)। শিল্প বিপ্লবোত্তর সময়ে যখন তাগুতী শক্তি বস্তুবাদী দর্শনের ওপর ভর করে তথাকথিত উন্নয়ন, প্রগতি ও প্রযুক্তির মোহময়তার আবরণে সাম্রাজ্যবাদী দূরাকাঙ্ক্ষাপূরণে মত্ত হয়ে ওঠে, তখন তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে এলেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)। তিনি কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে ইসলামের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক সকল বিধিবিধান বিশ্লেষণ করে পেশ করলেন ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সার্বিক রূপরেখা। পরবর্তীতে বস্তুবাদের ফেতনা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করলে পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরসূরি হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.) নতুন রূপে, ভিন্ন আঙ্গিকে, অন্য অবয়বে তা উপস্থাপন করেন। মূলনীতি অনুসরণ করে শাখা-প্রশাখায় সংযোজন করে একটি সমন্বিত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬৭ সনে তদানীন্তন অখণ্ড ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে নানুতভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে "দারুল উলুম দেওবন্দ" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটিই দেওবন্দ আন্দোলনের সূতিকাগার। সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদরাসা। এরই ফলশ্রুতিতে ছয় মাস পর দারুল উলুমের সিলেবাস, আদর্শ, কর্মনীতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় সাহারানপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় "মুজাহিরুল উলুম মাদরাসা"। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে তথা মীরাঠ, কানপুর, থানাভবন, মুরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে আরো বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। একপর্যায়ে দেওবন্দের কারিকুলামে দেশে-বিদেশে দ্বীনি মাদরাসার সংখ্যা বাড়তে থাকে। সে ধারাবাহিকতায় ১৯০১ সালে বাংলাদেশের প্রথম কওমী মাদরাসা দারুল উলুম মূঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে অসংখ্য কওমী মাদরাসা। যেমন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া আরবিয়া জিরি, জামিয়া ওবায়দিয়া নানুপুর, জামিয়া নসীরুল ইসলাম নাজির হাট,

জামিয়া আজীজুল উলূম বাবুনগর, ঢাকার লালবাগ মাদরাসা, বড়কাঠারা মাদরাসা, ফরিদাবাদ মাদরাসা, সিলেটে দরগাহ মাদরাসা, দক্ষিণবঙ্গে গওহারডাঙ্গা মাদরাসা, উত্তরবঙ্গে জামিল মাদরাসা বগুড়া ইত্যাদি।

উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, দেশে ২৬ থেকে ২৮ হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। (কালের কণ্ঠ ৮/৪/১৫)।

অধ্যাপক আবুল বারাকাতের মতে, দেশে মোট ৫৫ হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। (মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি পৃ. ৯)

তবে এটা সত্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছাড়াও কওমী কারিকুলামে মসজিদ, মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদরাসাকেন্দ্রিক আরো লাখো প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

কওমী মাদরাসার কর্মকাণ্ড :

কওমী মাদরাসার কর্মকাণ্ড ও কর্মতৎপরতার বিষয়ে সাইয়েদ আবুল আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন, 'মাদরাসা হলো এমন এক কর্মশালা, যেখানে মানুষ গড়ার সাধনা হয়, যেখানে দ্বীনের দা'ঈ এবং ইসলামের সিপাহি তৈরি হয়। মাদরাসা হলো ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎকেন্দ্র, যেখান থেকে ইসলামী জনপদে, বরং সমগ্র মানববসতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।' (জীবন পথের পাথেয়, পৃ. ৮৩)।

মাওলানা মনযুর নু'মানী (রহ.) বলেন, এসব মাদরাসার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, এখানে তা'লীম-তারবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা, যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করবে, তা সংরক্ষণ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, পরকালের মুক্তি, দ্বীনের খেদমত ও প্রচার-প্রসারই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে। (কওমী মাদরাসা আকাবিরের ভাবনা, পৃ. ৭৩)

মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) বলেন, এই মাদরাসাগুলোকে আপনারা আখেরাতের সম্বল মনে করে থাকেন, অবশ্যই মাদরাসাগুলো আখেরাতের সম্বল। কিন্তু এই মাদরাসাগুলো দুনিয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় সৎ মানুষের প্রয়োজন। আর এই সৎ মানুষ গঠন করা হয় এই মাদরাসাগুলোতে। (সূত্র : মুফতী আমিনীর নির্বাচিত ভাষণ 'আল্লাহর পথে', পৃ. ১১৫)।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে যখন সত্য ও সুন্দরকে অস্বীকার করা হয়, ন্যায়-অন্যায়ে যখন পার্থক্য থাকে না, মানবতা যখন পাশবিকতার রূপ নেয়, নীতি-নৈতিকতার যখন অপমৃত্যু ঘটে; ঠিক তখনই কওমী মাদরাসা মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে, ন্যায় ও নৈতিকতার দিকে, মানবিকতা ও ইনসানিয়াতের দিকে আহ্বান করে। উন্নত ও মহৎ জীবনের হাতছানি দিয়ে মানুষকে ডাকে।

দেশমাতৃকার জন্য কওমী মাদরাসার সংগ্রাম :

কওমী মাদরাসা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের নাম নয়। তবে রাজনীতি ধর্মেরই একটি অংশ। রাজনীতির কথা আসলেই দেশপ্রেম ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসার কথা চলে আছে। এ বিষয়ে কওমী মাদরাসা ও তার পরিবারের অবস্থান কী? হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.) লিখেছেন, 'বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতেও খেলাফতভিত্তিক ইসলামী রাজনীতি নেই। সর্বত্র পশ্চিমা ধ্যানধারণার রাজনীতির জয়জয়কার। তা সত্ত্বেও দেওবন্দের অনুসারীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে একেবারেই পৃথক নয়; বরং শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে দেশীয় কর্মকাণ্ডেও তাঁরা অংশ নেন। প্রয়োজনে দেশমাতৃকার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেন।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা কাসেম নানুতভী (রহ.) অগ্রণী সেনানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ইংরেজদের পতনের পর মুসলমানদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেসে অংশগ্রহণের ফাতওয়া দেন মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনেও দেওবন্দী আলেমদের একটি জামা'আত অংশগ্রহণ করে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর নেতৃত্বে আলেমগণ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হন। (ওলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনি রুখ আওর মসলকী মেযাজ, পৃ. ১৭০)। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আলেম সমাজের অবদানের বিষয়ে 'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' নামক বইটি পড়া যেতে পারে।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ :

দৈনিক কালের কণ্ঠ অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের শিরোনাম করেছে, "কওমী মাদরাসা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক"। তারা মধ্যখানে 'ও' বসিয়ে পৃথক দুটি শব্দ বুঝিয়েছে। যদিও তারা ব্র্যাকেটে (টেরিবলি ডেঞ্জারাস) লিখে দিয়েছে। আমরা মনে করি, মাঝখানে 'ও' শব্দটি বসিয়ে তারা শব্দদ্বয়ের যথার্থ অনুবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা একাডেমীর অভিধান মতে, ভয় শব্দের বিশেষণ হলো ভয়ংকর। যার অর্থ ভীতিপ্রদ, ভয়জনক, ভীষণ। আমরা মনে করি, অর্থমন্ত্রী ভয়ংকর শব্দটি মূল বক্তব্য হিসেবে নয়, 'বিপজ্জনক' শব্দে দৃঢ়তা আনার জন্য ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ এখানে ভীষণ। ভীষণ শব্দের অর্থ অতিশয়, অত্যন্ত ও ভয়াবহ। তাই একই দিন জনকণ্ঠ বলেছে, 'কওমী মাদরাসা শিক্ষা

অত্যন্ত বিপজ্জনক?' নয়াদিগন্ত বলেছে, 'কওমী মাদরাসা পদ্ধতি ভয়াবহ বিপজ্জনক'।

বিপদ শব্দের অর্থ–আপদ, বিপত্তি, দুর্দশা, দুরবস্থা। জনক শব্দটির অর্থ–পিতা, জন্মদাতা, উৎপাদক, বিধায়ক, কারক। প্রশ্ন হলো, কওমী মাদরাসা কেন বিপজ্জনক? এর ব্যাখ্যায় তিনি যা বলেছেন তা হলো, এরা সরকারের কাছ থেকে কোনো বরাদ্দ নেয় না। (জনকণ্ঠ, ঐ)

নয়াদিগন্ত বলেছে, 'কওমী মাদরাসা পদ্ধতি ভয়াবহ বিপজ্জনক। এরা সরকারি অনুদান নেয় না।' মন্ত্রীর এ বক্তব্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে। হতে পারে তিনি বিপজ্জনকের অর্থ দুর্দশা ও দুরবস্থা করে কওমী মাদরাসার প্রতি করুণাকাতর হয়েছেন যে আহ! তারা সরকারি টাকাও নেয় না, খুব কষ্টেই মনে হয় তাদের জীবন কাটে। এ অর্থ তাঁর অন্য বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি একবার বলেছেন, 'দেশে বৈদেশিক সাহায্য কমে গেছে, এটা কাম্য ছিল না। ঢাকার অবস্থা মোটামুটি সচল থাকলেও জেলাগুলোর অবস্থা খুবই বিপজ্জনক।' (এনটিভি অনলাইন : ৭/২/২০১৫ ইং)। মন্ত্রীর বক্তব্যকে ইতিবাচক ধরে আমরা এর উত্তরে বলব, সরকারি টাকা না নিলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সাহায্য-সহযোগিতায় কওমী মাদরাসা ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। তারা সরকারি টাকা গ্রহণের প্রয়োজনও বোধ করে না। এই সেদিন দেওবন্দ মাদরাসা ভারত সরকারের ১০০ কোটি রুপি ফেরত দিয়েছে। (ইত্তেফাক : ২৮/৩/১৫ ইং)

বাংলাদেশের আলেমরা কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে। আর মন্ত্রীর বক্তব্যকে নেগেটিভ অর্থে ধরা হলে তাঁর বক্তব্যের মূল কথা হলো, কওমী মাদরাসা আমাদের জন্য বিপদ উৎপাদনকারী, ভয়ের উদ্রেককারী। এ অর্থেও কখনো কখনো তিনি বিপজ্জনক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একবার তিনি বলেছেন, দেশের অর্থনীতি খুবই কষ্টে আছে... মানুষ পোড়ানো, গাড়ি পোড়ানো, সম্পদ পোড়ানো–এসব রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করা উচিত। দেশের ভবিষ্যৎটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে গেছে, (কালের কণ্ঠ : ৯/১২/২০১৩ ইং)।

তিনি যদি এই 'মিন' ও 'সেন্সে' কথাটি বলে থাকেন, তবে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভয়হীনচিত্তে তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য, বাংলাদেশে প্রচলিত হাজারো রকমের অপরাধ জগতের কোনোটির সঙ্গেই কওমী মাদরাসা জড়িত নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রমাণিত। উদারমনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। সত্য অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বনাম কওমী মাদরাসা :

স্বাধীনতার পর থেকে দেশে এ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে এবং এতে অগণিত মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে এর কোথাও কওমী মাদরাসার নূন্যতম সংশ্লিষ্টতা কোনোভাবেই প্রমাণিত নয়। এটি নিছক কোনো দাবি নয় বরং পরম সত্য ও বাস্তবতা।

তাহলে 'কওমী মাদরাসা বিপজ্জনক' কথাটি নির্লজ্জ মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি বনাম কওমী মাদরাসা :

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি শব্দটি থেকেও এখন অনেকে পরিত্রাণ চাচ্ছেন। ১৯৯৩ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'বিশ্বের সর্বাধিক সংঘাতপূর্ণ শিক্ষাঙ্গন' বলে চিহ্নিত করেছে। (বাংলাপিডিয়া, শিক্ষাঙ্গন সহিংসতা)। বর্তমানে এর তীব্রতা বোঝাতে হাজারো পৃষ্ঠার দরকার হবে না; গণমাধ্যমের দু-চারটা শিরোনাম দেখুন: ১৮/২/২০০৯ তারিখে প্রথম আলোর বিশেষ সংখ্যার লালকালির শিরোনাম, "চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের চক্রে ছাত্ররাজনীতি" সে বিশেষ সংখ্যাটি সবাই পড়ে দেখতে পারেন। "বিশ্বজিতের রক্তে হাত রাঙিয়ে আনন্দ করছে ছাত্রলীগ" (কালের কণ্ঠ : ১/১২/১২)। "আত্মঘাতী ছাত্রদল" (কালের কণ্ঠ : ২০/১০/১৪)। "শিবিরের ৫০ আস্তানা বোমা কারখানা" (কালের কণ্ঠ : ৭/১০/১৩)। "বিশ্বের ১০ শীর্ষ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকায় শিবির তৃতীয়" (কালের কণ্ঠ : ২৫/২/১৪)। আর এটা স্পষ্ট যে এসব কোনো বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডে কওমী মাদরাসা জড়িত নয়।

বাংলাদেশের সামাজিক অপরাধ বনাম কওমী মাদরাসা :

বাংলাদেশের হাজারো ধরনের সামাজিক অপরাধ রয়েছে। সেসবের কোনোটির সঙ্গেও কওমী পরিবার জড়িত নয়। "বছরে পাচার হচ্ছে ৩০ হাজার নারী ও শিশু"। (সমকাল : ৩/৩/২০১০)।

"যৌতুক : দেশের ৫০ ভাগ নারীই নির্যাতনের শিকার" (ইত্তেফাক : ৯/৭/১০)। সারা দেশে বেড়েই চলছে নারী নির্যাতনের মামলা, এক বছরে বেড়েছে সাত হাজার। (কালের কণ্ঠ : ৮/৩/১১)। "নারী নির্যাতনের কারণে বছরে ব্যয় ১৪ হাজার কোটি টাকা"। (কালের কণ্ঠ : ২২/৮/১১)। আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম, নারী-শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে হুজুরদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। 'শিশু গৃহকর্মীদের ৯৫ শতাংশই নির্যাতনের শিকার হয়' (কালের কণ্ঠ : ২৩/১/১২)। ২০১০ সালে বাংলাদেশে 'ইভ টিজিং' নামে নতুন সামাজিক অপরাধের জন্ম হয়েছে। এক বছরে ১২৬৯ উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৫২০। (প্রথম আলো :

২৮/১০/১০) এসব কোনো ঘটনার সঙ্গে কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক জড়িত নয়। এই সেদিন পহেলা বৈশাখের যৌন সন্ত্রাসের ঘটনায়ও কোনো কওমী পরিবারের সদস্য জড়িত ছিল না। দুর্নীতি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক অপরাধ। একাধিকবার বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রহমান বলেছেন, "দেশে ৪ হাজার ধরনের দুর্নীতি আছে" (যুগান্তর : ১৫/৩/১১)।

এসব দুর্নীতিতে কওমী মাদরাসার কেউ জড়িত নন। তার পরও বিপজ্জনক কেন? টেন্ডার-বাণিজ্য আরেক অপরাধের নাম। যেকোনো ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা পালাক্রমে এই 'শুভ' কাজটি করে থাকে। মাদরাসার ছাত্ররা কি টেন্ডারবাজি করে? পতিতাবৃত্তি, কর্মস্থলে "সেক্সুয়াল হেরেজম্যান্ট" শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন উম্মাদনা বাংলাদেশে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'যৌন হয়রানি বন্ধে জাতীয় কমিটি গঠন'। (যায়যায়দিন : ৩০/৭/০৮)। এসবের সাথে জড়িতরা সমাজের জন্য ভয়ংকর না হয়ে কওমী মাদরাসাকে কেন ভয়ঙ্কর বলা হবে? বেকারত্ব বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান সমস্যা। তবে আশ্চর্য হলো, কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ুয়া 'উচ্চশিক্ষিতদের প্রায় অর্ধেকই বেকার'। (প্রথম আলো : ২/৩/১৪ ইং)।

মাদরাসায় পড়ুয়ারা বেকার থাকে না। তারা ক্রমবর্ধমান মসজিদ-মাদরাসা ছাড়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে দেশ ও জাতির সেবা করছে। আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন যাপন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশের সমৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করছে। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত বেকার ৭৩.৩ শতাংশ। (আমার দেশ : ১/৭/১২ ইং)। কওমী মাদরাসায় তা জিরো পয়েন্টও হবে না। কেননা কওমী মাদরাসায় পড়ে কেবল দু-চারটা কালিমা, আযান-ইকামত শিখতে পারলেও সম্মানজনকভাবে বিভিন্ন মসজিদে চাকরি করা যায়!

জঙ্গিবাদ বনাম কওমী মাদরাসা :

জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের আরেকটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের অন্য হাজারো অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কওমী মাদরাসার সম্পৃক্ততার কথা তার শত্রু ও নিন্দুক শ্রেণীর মুখেও কখনো উচ্চারিত হয় না। এটাও সত্য যে বাংলাদেশে নিত্যদিন ছাত্ররাজনীতির নামে যেসব সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি, খুনাখুনি সংঘটিত হয়, 'জঙ্গিবাদী' অপরাধও একই ধরণের অপরাধ। স্পষ্টতই এসবের সঙ্গেও কোনো কওমী মাদরাসা জড়িত নয়। এ ছাড়া জঙ্গিবাদী হিসেবে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর সঙ্গে কওমী মাদরাসার সম্পর্ক তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে চিন্তা ও বিশ্বাসগত মতপার্থক্য রয়েছে। জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ সরকার যাদের ফাঁসি দিয়েছে, তারা কেউ কোনো দিন কওমী মাদরাসায় পড়েনি। জেএমবির আমীর শায়েখ আব্দুর রহমান ছিলেন আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ফজল মুন্সীর ছেলে। তিনি জামালপুর সরিষাবাড়ীর আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করে মদীনা ভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। তিনিই বাংলাদেশের সব বড় বড় হামলার জন্য অভিযুক্ত। জেএমবির কমান্ডার বাংলাভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। (The life and time of Bangla Bhai, Simon fraser University)। এ ছাড়া আতাউর রহমান সানি কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বোমা মিজান তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে, জেএমবির তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান বুয়েট থেকে অধ্যয়ন করেছেন। হিযবুত তাহ্‌রীরের প্রধান মহিউদ্দীন আহমদ ঢাবির অধ্যাপক ছিলেন। হিযবুত তাওহীদের বায়োজিদ পন্নী কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন। এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেখুন: www.monthlyattawheed.com

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে কওমী মাদরাসার হাত নেই। বহির্বিশ্বে আলোচিত জঙ্গি নাফিসও কিন্তু ভার্সিটির ছাত্র। এ ছাড়া এ বিষয়ে বেসরকারি একটি ইউনিভার্সিটির কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আমরা কিন্তু তাদের জঙ্গি প্রজননকেন্দ্র বলছি না। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশের বিষয়ে গবেষণা করেছেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের Criminology and police Scienc Department এর সহযোগী অধ্যাপক মুহাঃ আজিজুর রহমান এবং Center of criminology Reserch, Bangladesh এর পরিচালক মোহাম্মদ বিন কাসেম। তাঁরা এ গবেষণাপত্রের 7.2.3 Prevention chapter দ্বিতীয় লাইনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন–

The study Found That madrassa is not responsible for the rise of militancy

অর্থাৎ, এই গবেষণা খুঁজে পায় যে, মাদরাসাগুলো জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী নয়। উল্লেখ্য, গবেষণাপত্রটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের Social Science Research Council, Planning Division এর কাছে দাখিল করা হয়েছে। তবুও কেন তাদের কাছে কওমী মাদরাসা 'টেরিবলি ডেঞ্জারাস!

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১৩

উলামায়ে দেওবন্দের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য

উলামায়ে দেওবন্দের উম্মতের ওপর এটা একটা বড় অনুগ্রহ যে, তারা বাতিলের প্রতিরোধকে একটা স্বতন্ত্র ফন এবং বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ফলে বিষয়টা আয়ত্ত করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে।

উম্মাহর ঈমান-আমল রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী

আপনি দেখবেন, কোনো ফিতনা যখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এর বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দের কণ্ঠই সর্বপ্রথম উচচকিত হয়। কত ফিতনা কত মনোহারি আকৃতিতে মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলতে অপপ্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দের সজাগ মনোভাবের কারণে তাদের সেই অপপ্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সে জন্য আপনি দেখবেন, যেখানে উলামায়ে দেওবন্দের সরব পদচারণ নেই, সেখানে নতুন নতুন ফিতনা মুসলমানদেরকে সহজেই বিভ্রান্ত করছে। বাতিল বড়ই ধুরন্ধর প্রকৃতির হয়ে থাকে! তাদেরকে প্রতিরোধও করতে হয় খুব সুনিপুণতার সাথে। সে জন্য যেসব আলেমের সাথে জনসাধারণের মেলামেশা নেই, তাদের কোনো মতামত দেখে বিভ্রান্ত হতে নেই।

আহমদ রেজা খানের ধূর্তামি

বেরলভীদের পুরোধা আহমদ রেজা খান 'হুসামুল হারামাইন' নামে একটি কিতাব রচনা করে। এই পুস্তকে সে উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন উর্দূ গ্রন্থ থেকে কিছু বর্ণনা আরবীতে অনুবাদ করে। অনুবাদ করতে গিয়ে কত ছলচাতুরি এবং জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এই পুস্তক সে হারামাইন এবং তুর্কিস্তানে পাঠায় এবং সেখানকার আলেমদের ফাতওয়া সংগ্রহ করে। ওখানকার আলেমরা যেহেতু তার শঠতা সম্পর্কে অনবহিত, তাই তারা এসব আকিদা পোষণকারীকে কাফের ফাতওয়া দিয়ে দেয়। তাদের পক্ষ থেকে জবাব আসার পর সে আবার ওই আরবীর অনুবাদ নিজের ভাষায় করে। এরপর সে জনসাধারণকে বোঝাতে থাকে, দেওবন্দীদেরকে আরব এবং তুর্কিস্তানের আলেমরা কাফের ফাতওয়া দিয়েছে। তার এই গোমর ফাঁস করার জন্য হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) কলম উঠালেন। তিনি আরবী ভাষায় রচনা করেন অনবদ্য গ্রন্থ–المهند على المفند. 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' উর্দূ ভাষায় সেটি عقائد علماء دیوبند নামে প্রকাশিত হয়েছে। সাহারানপুরী (রহ.) পুস্তকটিতে উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা-বিশ্বাসকে চমৎকার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ প্রয়াসের কারণেই বেরলভীদের অপপ্রয়াস মাঠেই মারা গেল।

বাতিল প্রতিরোধের কার্যকর পন্থা

বাতিলকে সহজেই হেনস্থা করার কার্যকর পন্থা হচ্ছে, তারা যে বিষয়ে জনগণকে ভুল বোঝাচ্ছে, সে বিষয়টা জনগণের সামনে সুস্পষ্ট করে তাদের ধূর্তামির গোমর ফাঁস করে দেওয়া। একটি কথা স্মরণ রাখি, জনসাধারণ দলিল-প্রমাণের কী বুঝবে? তাদের সামনে যদি বাতিলের গোমর ফাঁস করা যায়, বাতিলের স্বরূপ যদি তাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করা যায়, তাহলে কেল্লাফতে! বাতিল তখন সেখান থেকে প্রস্থানে বাধ্য হবে!

হিন্দুস্তানের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার বাড়ি ভারতের ফয়জাবাদে। ফয়জাবাদের পাশেই লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌতে শিয়া-সুন্নির মাঝে বড় ধরনের মতবিরোধ ছিল। তখন ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আব্দুশ শাকুর (রহ.) এবং তৎকালীন অন্য বড় আলেমরা এ কাজের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। তাঁরা সর্বপ্রথম আলেম-উলামা এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে সমবেত করে বাতিলের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতেন। তাদের প্রতিরোধে কোন ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, তাও বিশদভাবে উঠে আসত আলোচনায়। দলিল-প্রমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতো, তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হতো, কোন বিষয়টি জনগণের ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অথবা কোন বিষয়টি জনসাধারণের হেদায়তের ওসিলা হতে পারে, তা নিয়ে। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক সময় বড় বড় দলিল-প্রমাণও যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে, সেখানে ছোট-ছোট কথাও অনেক বেশি উপকারী সাব্যস্ত হয়। তৎকালীন সময় প্রায় সব নবাব শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সুন্নিরা ছিল চরমভাবে নিগৃহীত এবং নিপীড়িত। সুন্নিদের ওপর কত ধরনের উৎপীড়ন চালানো হতো, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এমনকি শিয়ারা যে কোরআনে বিশ্বাসী ছিল, সেটাই সুন্নিরা নিজেদের বাসায় রাখত। আসল কোরআন সুন্নিরা নিজেদের বাসায় রাখাটা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো। শিয়াদের মতে, সুন্নিরা অপবিত্র। তারা পঞ্জেতন পাক (অর্থাৎ আল্লাহ, মুহাম্মদ (সা.), হাসান, হোসাইন, আলী, ফাতেমা)-এর নাম উচচারণ করার অধিকার রাখে না। আমি এই দুরবস্থার কথা এ জন্য বর্ণনা করছি যে, আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে হকপন্থীরা কোথাও এত বেশি অত্যাচারের শিকার হচ্ছে না। ওখানকার সত্যপন্থীরা এত বেশি নির্যাতিত হওয়ার পরও যখন কাজ শুরু করেন, তখন তাঁরা এর আশাতীত

ফল পান। উলামায়ে কেরাম যখন নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে শিয়াদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন পুরো দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যেখানে একসময় শিয়াদের আধিক্য ছিল, সেখানে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ল। এমনকি শিয়ারা অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত হলো। যাদের সাথে শিয়াদের বিয়ে হয়েছিল, সেগুলো জনসম্মুখে ভেঙে দেওয়া হলো।

শিয়া-সুন্নির মধ্যকার একটি ঐতিহাসিক মোকাদ্দমা

শিয়া-সুন্নির মাঝে বিরোধ যখন তুঙ্গে, তখন সেখানে একটি ঐতিহাসিক মোকাদ্দমার রায় ঘোষণা করা হয়। মোকাদ্দমা ছিল, ৯ এবং ১০ মুহাররম যখন শিয়াদের তা'যীয়া বের হবে, তখন সুন্নি মুসলমানরা তা'যীয়া দেখলে নিজেদের মাথার টুপি খুলে ফেলবে। কেননা, এতে তা'যীয়ার সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সুন্নিরা টুপি খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। জজ ছিল ইংরেজ। আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করা হলো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পক্ষে ছিলেন মাওলানা আব্দুশ শাকুর (রহ.)। ইংরেজ জজ শিয়া উকিলকে বলল, আপনি মতের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করুন। তখন শিয়া উকিল বলেন,

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

অর্থাৎ, আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলিকে সম্মান প্রদর্শন করা মূলত খোদাভীতিরই পরিচায়ক! (দেখুন কোরআনের আয়াতকে কত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে! কোন বিষয়ের আয়াতকে কোন বিষয়ের ওপর ফিট করা হচ্ছে) মাওলানা আব্দুশ শাকুর (রহ.) বললেন, যেটা পাঠ করলেন, সেটা কী? শিয়া উকিল আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গিতে বললেন, কোরআনের আয়াত। মাওলানা বললেন, কোরআন থেকে দেখিয়ে দাও। শিয়া উকিল অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করেও আয়াতটি খুঁজে পায় না। প্রায় ২০-২৫ মিনিট পরও যখন সে খুঁজে পায়নি, তখন ইংরেজ জজ ফায়সালা দিয়ে দিল, যেহেতু শিয়াদের বক্তব্য প্রমাণবিহীন, তাই সুন্নিদের পক্ষেই ফায়সালার রায় দেওয়া হলো। অর্থাৎ তা'যীয়া বের হলে তাদেরকে মাথা থেকে টুপি খুলতে হবে না। এদিকে ঘটনা শেষ হওয়ার পর ওই শিয়া উকিল পুরো কোরআন তন্নতন্ন করে খুঁজে আয়াতটি বের করে এবং হন্তদন্ত হয়ে মাওলানা আব্দুশ শাকুর (রহ.)-এর কাছে এসে বলে, মাওলানা! রায় তো আমার বিরুদ্ধে গেছে। কিন্তু আপনি যে ভরা মজলিশে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন, এ জন্য আপনার ঈমান নবায়ন করুন। হযরতের সঙ্গী-সাথীরাও বলতে লাগল, এভাবে কোরআনের একটি আয়াতকে অস্বীকার করাটা কি ঠিক হলো? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমি পবিত্র কোরআনের কোনো আয়াতকে অস্বীকার করিনি। বরং আমি জানি,

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

এটা কোরআনের আয়াত। তবে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, যে কুলাঙ্গার কোরআনের অর্থ বিকৃত করে নিজের স্বপক্ষে নিয়ে আসার অপচেষ্টা চালায়, কোরআন তার কোনো উপকারে আসবে না। এই শিয়া যেহেতু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করছে, তাই আমি তাকে বললাম, এই আয়াতটা কোথায় আছে, আমাকে দেখাও। আমি কি এটাকে কোরআনের আয়াত বলে অস্বীকার করেছি। তখন শিয়া উকিল নিরুত্তর হয়ে গেল।

বাতিলের প্রতিরোধ করতে হবে এভাবে

লক্ষ্ণৌতে যখন শিয়াদের জয়জয়কার ছিল, তখন তারা শহীদে ইসলাম নাম দিয়ে বড় বড় সেমিনার করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের সকল শহীদকে বাদ দিয়ে হযরত হোসাইনের গুণকীর্তনে মেতে ওঠা। প্রকারান্তরে তারা এটাই চাচ্ছিল যে মুসলমানদের অন্তর থেকে যেন অন্য শহীদের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব লোপ পেয়ে যায় এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। ওখানকার উলামায়ে কেরাম সজাগ হলেন এবং শোহাদায়ে (শহীদের বহুবচন) ইসলাম নাম দিয়ে বড় বড় কনফারেন্স করতে লাগলেন। ইসলামের সকল শহীদের পুরো জীবনালেখ্য তাঁরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। বদর, উহুদ, হোনাইন, খন্দকসহ ইসলামের সকল যুদ্ধে কত মুসলমান শাহাদাতের অনন্য মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন, তা ওখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার মুখে মুখে অনুরণিত হচ্ছিল। ফলে শিয়াদের অপচেষ্টা মাঠেই মারা গেল। এভাবেই বাতিলের মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতিটি এলাকায় কিছু সচেতন যুবক তৈরি করুন

আমাদের হিন্দুস্তানে উলামায়ে দেওবন্দের একটি কার্যক্রম খুব বেশি ফলপ্রসূ এবং প্রশংসনীয় হয়েছে। তা হলো, প্রতিটি এলাকায় তাঁরা এমন কিছু লোক তৈরি করেছেন, যারা তাঁদের পক্ষ হয়ে যেকোনো বাতিল ফেরকার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এ ধরনের কাজে যুবকরাই বেশি অংশ নিয়ে থাকে। এখানেও এ ধরনের কার্যক্রম চালু করা যায় কি না, তা নিয়ে উলামায়ে কেরাম ফিকির করতে পারেন। এ কমিটি এলাকাভিত্তিকও হতে পারে, তবে মসজিদভিত্তিক হলেই বেশি ভালো। কিছু সচেতন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে, তারা যেন যেকোনো বাতিলের সাথে প্রাথমিক বিতর্কে জয়ী হতে পারে। এসব কমিটিতে যুবকদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ পদ্ধতিটি অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার কারণ হচ্ছে, দেশের শহর থেকে মফস্বল, টাউন থেকে গ্রামাঞ্চল সব ক্ষেত্রে আপনাকেই দৌড়াতে হয়, তাহলে আপনি কয় জায়গায় যেতে পারবেন? আপনার যেতে যেতে তো বাতিলরা সেখানে নিজেদের শিকড় গেড়ে বসবে। আর কোনো এলাকার মানুষের স্বভাব-চরিত্র, তাদের রীতিনীতিও আপনার জানা থাকার কথা নয়। সাথে সাথে লা-মাযহাবী আলেমরা যেমন নিজেদেরকে প্রকাশ করে না, বরং জনসাধারণকে আলেমদের পেছনে লেলিয়ে দেয়, আমাদের মুখপত্রও যখন

জনসাধারণ হবে, তখন এই সমস্যাটিও আর হবে না, বরং তখন সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষেরই মুখোমুখি হবে। বাতিলের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সাথে সাথেই যেন কেউ জবাব দিতে পারে, এ জন্য এ ধরনের কমিটি থাকা খুব বেশি প্রয়োজন।

উলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য

আমাদের আকাবিরদের এটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, যাদের সাথেই তাদের চলাফেরা, উঠাবসা হতো, সবাই তাদের মতাদর্শেই বিশ্বাসী হতো। আমাদের আকাবিরদের সাথে জনসাধারণের আত্মার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয়, আলোকিত পূর্বসূরিদের এই উত্তরাধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে পড়ছি। জনসাধারণের সাথে যেখানে আমাদের চতুর্মুখী সম্পর্ক থাকা দরকার ছিল, সেখানে তাদের সাথে মুখ চেনা পরিচয়ও নেই। নতুন প্রজন্মের সাথে এই দূরত্বটা ক্রমেই বাড়ছে। আকাবিরদের জীবনী একটু পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাই, যে লোক তাদের বাড়িতে দুধ নিয়ে আসে, সেও তাদেরই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে যায়। তদ্রূপ নরসুন্দর, ধোপা সবার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, লক্ষ্ণৌর কিছু অমুসলিম বাসিন্দার সাথে সুন্নিদের সম্পর্ক ছিল। অমুসলিমরা শুধু এই সম্পর্কের কারণেই শিয়াদের বিরুদ্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারত। তাঁরাও স্পষ্টভাবে জানতেন, শিয়া-সুন্নির মাঝে কোন কোন মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে? এখন আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার অভাব নেই। শত শত ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদেরকে পূর্বসূরিদের নির্দেশিত পথেই হাঁটতে হবে। ইমাম মালেক (রহ.)-এর ভাষায়–

لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها

উম্মাহর শেষ অংশের সংশোধন হবে সে পথেই, যে পথে সংশোধিত হয়েছে উম্মাহর প্রথম অংশ।

এ পথেই আমাদেরকে এগোতে হবে। জনসাধারণের সাথে আমাদের নিবিড় ঈমানী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সঠিক আকিদা-বিশ্বাস তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করতে হবে। স্মরণ রাখবেন, যে দেশের জনসাধারণ হকপন্থী উলামাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, সেখানে কখনো বাতিলের অনুপ্রবেশ হতে পারে না। জনগণকে সঠিক কথা বোঝাতে হবে। পাবলিক ওপেনিয়ান বা জনমত নিজেদের পক্ষে করার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হোন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌর উলামাদের মহান কীর্তি আমাদের জন্য আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

এসব তরবিয়তী কোর্সের উদ্দেশ্য কী?

স্মরণ রাখবেন, এসব তরবিয়তী কোর্স, কিংবা মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য কিন্তু এসব মাসআলার ইলমী দলিল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা নয়, বরং আমার মতে, এসব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা মাদরাসার জান্নাতী পরিবেশে যে ইলম অর্জন করলাম, সেগুলো জনসাধারণের ময়দানে কিভাবে কাজে লাগাব? বিষয়গুলোকে কোন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করলে গণমানুষের জন্য সহজবোধ্য হবে। এসব বিষয়ে পরস্পর মতবিনিময়, আলোচনা এবং পরামর্শের জন্যই মূলত এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা

অনেকেই বলেন, এসব কোর্সের আয়োজন অনর্থক। আমি বলি, বর্তমানে এসব কোর্সের আয়োজন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। কারণ আমি অনেক ধীমান আলেমকেও দেখেছি, বিভিন্ন বাতিল মতবাদের সূক্ষ্ম জালে ফেঁসে গেছেন। বর্তমানে তো আমাদের ইলম আমাদের জন্যই উপকারী সাব্যস্ত হচ্ছে না। না হলে আমরা বাতিলের ষড়যন্ত্রে ফেঁসে যাচ্ছি কেন? নিজেকে সর্বগ্রাসী ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য, নিজের অর্জিত ইলমকে উপকারী সাব্যস্ত করার জন্য, সর্বোপরি জনসাধারণকে নিজের ইলম দ্বারা আলোকিত করার জন্য এই সব কোর্সে অংশগ্রহণ করা আমি অতীব জরুরি বলে মনে করি। তবে অবশ্যই কোর্স হতে হবে কোনো মুহাক্কিক আলেম কর্তৃক পরিচালিত।

জনসাধারণের সাথে কেমন সম্পর্ক হওয়া চাই?

সাধারণ মানুষের কোনো স্বতন্ত্র মাযহাব থাকে না। বরং ইমামের যে মাযহাব, তারও সেই মাযহাব। আপনি পরীক্ষা করে দেখেতে পারেন। একজন ইমামের অন্তরে তাঁর মুক্তাদীদের সম্পর্কে যত আন্তরিকতা এবং হৃদ্যতা থাকবে, মুক্তাদীরা ওই ইমামের প্রতি ততই শ্রদ্ধাশীল হবে। একজন আলেমের সাথে জনসাধারণের কেমন সম্পর্ক থাকা চাই? আল্লাহ তা'আলা হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) কে রহম করুন। তিনি তাঁর জগৎখ্যাত জীবনচরিত আপবীতিতে এ ধরনের অনেক চমৎকার ঘটনা বিবৃত করেছেন। বিশেষত আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.) এবং খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর সাথে তাঁদের ভক্তদের কত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, তাও বিশদভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ভক্তরাও নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। আমাদেরকে জনসাধারণের সাথে কাজ করতে হলে আকাবিরদের অনুসৃত পথেই এগোতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প পথে সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পুনরায় উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

যেহেতু এ মজলিসটা শেষ মজলিস, তাই ইলমী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে হয়তো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় হয়ে উঠবে না। তাই আলোচনার পূর্বেই ওই সব কথা বলে ফেললাম। এখন আমরা মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

তাকবীর বলে নামায শুরু করা হয়। এরপর নাভির নিচে হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা পড়া হয়। সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলতে হয়। এরপর অন্য আরেকটি সূরা মিলাতে হয়। এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। এরপর রুকুতে যেতে হবে। এখানেই আমাদের সাথে লা-মাযহাবীদের আবার মতবিরোধ শুরু হয়। রফয়ে ইয়াদাইন করা না করা নিয়ে। তার দলিল-প্রমাণ কী? কোথায় কোথায় রফয়ে ইয়াদাইন

করা হবে আর কোথায় কোথায় করা হবে না?

রফয়ে ইয়াদাইন

সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। বরং সংক্ষিপ্ত কিছু ইশারা দিয়ে যাব।

প্রথমেই বুঝতে চেষ্টা করি। চার রাক'আতবিশিষ্ট একটা নামাযে সম্ভাব্য ক'বার রফয়ে ইয়াদাইন হতে পারে? প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে একবার, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর। এখন সর্বমোট ১২ (বার) বার হলো। প্রথম সিজদায় যাওয়ার সময়, প্রথম সিজদা থেকে ওঠার পর, দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়ার সময়, দ্বিতীয় সিজদা থেকে ওঠার পর। এখানে সর্বমোট ষোল বার হলো। ষোল+বার=আটাশ বার। আটাশ থেকে প্রথম রফয়ে ইয়াদাইন অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার যে রফয়ে ইয়াদাইন করা হয়, তা পুরো উম্মাহর মাঝে সর্বজনস্বীকৃত। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা বলা ফরজ এবং উভয় হাতকে কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। এটা নিয়ে কারো মাঝে মতভেদ নেই। অবশিষ্ট ২৭ রফয়ে ইয়াদাইন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। লা-মাযহাবীদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার সময় পুরো নকশা আপনাদের স্মরণ থাকা চাই। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। রুকুর পূর্বে রফয়ে ইয়াদাইনের কথা যেমন হাদীস শরীফে বিবৃত হয়েছে, তদ্রূপ সিজদায় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করার কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে উভয় সিজদার মাঝখানে এবং সিজদা থেকে ওঠার পর রফয়ে ইয়াদাইন করার কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এ কথাটাও স্মরণ রাখবেন। এসব রফয়ে ইয়াদাইনে কেবল প্রথম রফয়ে ইয়াদাইনের সাথেই যিকির তথা আল্লাহু আকবর বলার কথা হাদীসে আছে।

যদি দ্রুতই তাদেরকে পরাস্ত করতে চান

যারা রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা করতে অধিক আগ্রহী, আপনি তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে, তোমরা রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে হাদীস উপস্থাপন করছো, আমি রফয়ে ইয়াদাইন না করার পক্ষে হাদীস উপস্থাপন করছি। তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠবে, কোথায় আছে রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস? আপনি বলুন, যেখানে রফয়ে ইয়াদাইন করার হাদীস আছে, সেখানে রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসও আছে। সামান্যতমও বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। তাদেরকে কিতাব নিয়ে আসতে বলুন। যে কিতাবই নিয়ে আসুক না কেন, রফয়ে ইয়াদাইন করার পক্ষের হাদীস যেখানে আছে, তার ওপরে-নিচে রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস আপনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন। সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা এবং না করা সম্পর্কে। সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে রফয়ে ইয়াদাইন করা এবং না করা সম্পর্কে! তাদেরই আনীত কিতাব থেকেই তাদের উত্তর দেওয়া যাবে।

জনসাধারণকে বোঝাতে থাকুন

সাথে সাথে জনসাধারণকেও বোঝাতে চেষ্টা করুন যে শুনুন, তাদের সাথে অষ্টপ্রহর আলোচনা হলেও আমরা কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব না। কারণ তারা যেখানে যেখানে রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা, এ ছাড়া অন্য জায়গাতেও রফয়ে ইয়াদাইনের কথা আছে। এরা যেখানে যেখানে রফয়ে ইয়াদাইন করে না, সেখানেও রফয়ে ইয়াদাইনের কথা আছে। দেখুন, হাদীসে উভয় সিজদার মাঝখানে রফয়ে ইয়াদানের কথা আছে, এরা কিন্তু তা করে না। জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, কিছু হাদীসে যে রফয়ে ইয়াদাইনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা পুঙ্খানুঙ্খভাবে এরাও পালন করে না। কিভাবে পালন করে না, তা হাদীস শরীফ থেকে জনসাধারণকে দেখিয়ে দিতে হবে।

লা-মাযহাবীরা কোন রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা

মূলত লা-মাযহাবীরা তিনটি রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে বেশি বাড়াবাড়ি করে। প্রথম, রুকুতে যাওয়ার সময়, দ্বিতীয়ত, রুকু থেকে ওঠার পর। তৃতীয়ত, আত্তাহিয়্যাতুর পর, অর্থাৎ, চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে যখন দ্বিতীয় রাক'আতের পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়।

কেন হীনমন্যতায় ভুগবেন?

শুরু থেকে আমরা একটা ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে যাই। রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ হাদীসের সমস্ত কিতাবে অসংখ্য হাদীস আছে। আর আমাদের পক্ষে তেমন কোনো হাদীস নেই। এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এ ধারণাকে মনের চৌহদ্দিতেও আসতে দেবেন না। আমি আপনাদের পূর্ণ আশ্বস্ত করে বলছি, লা-মাযহীরা যে রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা, তার কোনো দলিল হাদীস শরীফে নেই। আমি পূর্বেই বলেছি, লা-মাযহাবীরা তিনটি রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা। আপনি যার সাথে আলোচনা করছেন, সে যদি বলে, আমি রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার পর, প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকি। (সেও কিন্তু সিজদায় যে রফয়ে ইয়াদাইনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা আমল করে না) ঠিক আছে, আপনি সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করে নিন। কারণ আমি পূর্বেও বলেছি, লা-মাযহাবীরা আল্লাহকে মোটেও ভয় করে না। মিথ্যা বলাটা তাদের কাছে ডাল-ভাতসদৃশ। সেজন্য তারা লেখালেখিকে খুব বেশি ভয় করে। এ জন্য তাদের সাথে যে কথাবার্তাই হয়, তা লিপিবদ্ধ করে নিন।

রফয়ে ইয়াদাইনের শরয়ী বিধান কী?

এখন তার সাথে কথা বলুন, আপনারা যে রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন (যেখানেই করুন না কেন) তার শরয়ী বিধান কী? অর্থাৎ আপনারা রফয়ে ইয়াদাইন কী বুঝে করে থাকেন? সুন্নাত? ওয়াজিব? জায়েয? মুবাহ? যদি তারা বলে, জায়েয। তবে কেল্লা ফতে। যদি তারা বলে, করা না করার স্বাধীনতা আছে। তাহলেও আপনার উদ্দেশ্য সফল। যদি বলে, রফয়ে ইয়াদাইন ওয়াজিব তথা এটা নামাযের জন্য

অত্যাবশ্যকীয়, তখনও আপনি সফল। আর সুন্নাত স্বীকার করে নিলেও আপনি শতভাগ সফল। কারণ, সে রফয়ে ইয়াদাইনকে যাই বলুক না কেন, সুন্নাত, ওয়াজিব, জায়েয, মুবাহ আপনি তার সামনে হাদীসের একটি কিতাব রেখে তাকে বলুন, রাসূল (সা.) রফয়ে ইয়াদাইনকে জায়েয, ওয়াজিব, সুন্নাত আখ্যা দিয়েছেন। এ রকম একটি হাদীসও উপস্থাপন করুন। তোমরা রফয়ে ইয়াদাইনকে সুন্নাত, মুস্তাহাব, ওয়াজিব, যাই বলো না কেন, হাদীসে রাসূল (সা.) থেকে তা বের করে দেখাও। তখন লা-মাযহাবীরা নিরুত্তর হয়ে যাবে এবং বারবার বলবে, এই হাদীস বোখারী শরীফে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে। আপনারা লোকদেরকে এ কথাও বলে দিন যে, আমাদের সুহৃদরা যার নাম বারবার উল্লেখ করছে, তিনি হলেন হযরত ওমর (রা.)-এর আত্মজ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)। তিনি ছোট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রেই রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এসব কথাও আপনারা লিপিবদ্ধ করে নিন এবং লোকদেরকে কণ্ঠস্থ করে দিন।

এখন আপনারা বোখারী শরীফসহ হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ সামনে রাখুন। জনসাধারণকে বলুন, আমরা যদি আরো বেশি জ্ঞানগত গবেষণা উপস্থাপনা করি, তাহলে আপনাদের প্রচুর সময় বিনষ্ট হবে। আমরা আপনাদেরকে একটা মৌলিক কথা বলে বিষয়টার সুরাহা করতে চাই। আপনারা অনুমতি দিলে আমরা শুরু করতে পারি। লোকেরা তখন সবাই বলবে, বলুন! তখন আপনি শুরু করুন, আমাদের সকলের ঈমান-আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার আদেশের গুরুত্ব রাসূল (সা.)-এর আদেশের চেয়ে বেশি। পবিত্র কোরআনের সম্মান হাদীস শরীফের ওপর এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কথা সঠিক কি না? সবাই সমস্বরে বলবে, পুরোপুরি ঠিক। তখন আপনি বলুন, কোনো বিষয়ে যদি হাদীস শরীফে বাহ্যত সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার সমাধান দেবে কে? লোকেরাই চিৎকার করে বলে উঠবে, আল কোরআন। আপনি বলুন, আমাদের লা-মাযহাবী সুহৃদরা দাবি করছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আমি বলছি, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইন না করার কথা আছে। লা-মাযহাবী সুহৃদরা শুধুমাত্র তিন জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা হলেও হাদীস শরীফে কিন্তু চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে আটাশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইনের কথা বলা হয়েছে। আপনারা যদি বলেন, এসব বিষয় আমি হাদীস শরীফ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারি। চিন্তার কোনো কারণ নেই, সব বর্ণনাই হাদীসের কিতাবে আপনি পেয়ে যাবেন।

কতই না সুস্পষ্ট ফায়সালা

আপনারা যদি চান, তাহলে আমি দুপুরের সূর্যের মতোই সুস্পষ্ট কথা আপনাদেরকে শোনাতে পারি। তবে শর্ত হলো, কোরআনের বাণী শোনার পর আপনাদেরকে মানতেই হবে। কারণ, কোরআন অস্বীকার করলে কেউ আর মুসলমান থাকে না। বরং সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। আপনারা কোরআনের বাণী মানতে প্রস্তুত না হলে এখনই বলে দিন, আপনাদেরকে কোরআনের বাণী শোনাব না। আপনারা যদি ওয়াদাবদ্ধ হন যে, রফয়ে ইয়াদাইনের মাস'আলার ক্ষেত্রে আমরা কোরআনে করীমকেই বিচারক হিসেবে মানব, তাহলে আমি এ মুহূর্তেই আপনাদের সামনে কোরআনের দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা শোনাচ্ছি। ফায়সালাও আমি আমার অপবিত্র মুখ দিয়ে করব না, বরং রাসূল (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবীর মাধ্যমেই ফায়সালা করব। তারা রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহর বর্ণনা পেশ করে থাকে। আমি রফয়ে ইয়াদাইন না করার পক্ষে রাসূল (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কোরআনের তাফসীর পেশ করব। তখন নিঃসন্দেহে জনগণ বলবে, মাওলানা সাহেব! আপনার যা বলার আছে বলুন। তখন আপনি ওই মাওলানা থেকে ওয়াদা নেবেন, সে আপনার কথার মাঝখানে কথা বলবে না। এখন আপনি পবিত্র কোরআনের সূরা মু'মিনের আয়াত দুটি তেলাওয়াত করুন–

قد افلح المومنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون

অর্থ : মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী-নম্র। (সূরা আল-মুমিনুন-১-২)

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন–

خاشعون الذين لا يلتفتون يمينا وشمالا ولا يرفعون ايديهم فى الصلاة

অর্থাৎ যারা নামাযে ডানে-বামে ফিরে না এবং নামাযে বারবার রফয়ে ইয়াদাইন করে না।

এখন আপনি জনসাধারণকে জিজ্ঞেস করুন, রাসূলের সাহাবীর বুঝ বেশি উত্তম হবে, না এই মাওলানার বুঝ উত্তম হবে? তখন ওই লা-মাযহাবী কথা বলতে চাইলে আপনি তাকে তার ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিন যে সে মাঝখানে কথা বলতে পারবে না। এখন আপনি কথা বললে আমি চুপ হয়ে যাব। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, তখন সে আর কিছু বলবে না।

নামায অর্থই যিকির

এরপর আপনি কোরআনের দ্বিতীয় আয়াতটি পাঠ করুন–

واقم الصلاة لذكرى

অর্থ : এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বহা-১৪)

পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মতে, পুরো নামাযই আল্লাহ তা'আলার যিকির। নামাযের এমন কোনো অংশ নেই, যেখানে কোনো যিকির নেই। নামাযের শুরু অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা থেকে নিয়ে সালাম পর্যন্ত এমন কোনো রুকন নেই, যেখানে কোনো যিকির নেই।

এখন এই রফয়ে ইয়াদাইন যদি নামাযের অংশ হতো, সুন্নাত হতো, তাহলে তার জন্যও কোনো স্বতন্ত্র যিকির থাকত। লা-মাযহাবী বন্ধুরা অনেক হাদীস পেশ করলেও রফয়ে ইয়াদাইন করার সময় কী পড়তে হবে, তা কিন্তু বলেননি। মজার বিষয় হচ্ছে, হাত উঠানোর সময় আল্লাহু আকবর বলার যে বিধান রয়েছে তা কেবল তাকবীরে তাহরীমার জন্য। অন্য রফয়ে ইয়াদাইনের সময় কী পড়তে হবে, তা তাদের উপস্থাপিত হাদীসসমূহে নেই।

লা-মাযহাবী বন্ধুরা রফয়ে ইয়াদাইনের সময় কী পড়ে?

আমরা জিজ্ঞেস করি, লা-মাযহাবী বন্ধুরা বারবার হাত উঠানোর সময় আল্লাহু আকবর পড়ে থাকে, না অন্য কিছু পড়ে থাকে? এখানে এ কথাও জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, মুসলমানরা যেখানেই হাত উঠায়, সেখানেই অবশ্যই যিকির করে থাকে। হজ আদায় করতে ইসতিলাম করার সময় আল্লাহু আকবর বলে থাকে। রমি জেমার যখন করে, তখনও হাত উঠানোর সময় যিকির করে। সফা-মারওয়ায় যখন দু'আর জন্য হাত উঠায়, তখনও যিকির করে। এমনকি আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন আঙ্গুলি উঠায়, তখনও যিকির করে। এখন নামাযে যে রফয়ে ইয়াদাইন করা হয়, তা কিন্তু যিকির থেকে সম্পূর্ণ খালি। এ জন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বারবার হাত উত্তোলন করাকে নামাযে একাগ্রতা অর্জনের পরিপন্থী বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। জনসাধারণকে বলুন, এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার। চাইলে আল্লাহ, রাসূল ও সাহাবীর কথা মানতে পারেন, অন্যথায় এই মাওলানার কথা মানতে পারেন। এখন লা-মাযহাবীকে প্রশ্ন করুন, হযরত! প্রথম রফয়ে ইয়াদাইন বাদ দিয়ে বাকি সাতাশ রফয়ে ইয়াদাইনের মধ্যে ৯টি সুন্নাত, অবশিষ্টগুলো সুন্নাত নয়, এমন কোনো হাদীস পেশ করুন। অর্থাৎ আমরা তো হাদীস দিয়ে সাতাশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইনের কথা প্রমাণিত করেছি, কিন্তু আপনারা ওখান থেকে মাত্র ৯টি রফয়ে ইয়াদাইনের প্রবক্তা, অবশিষ্টগুলো আমল করেন না। কোন হাদীসে এই বিভাজন করা হয়েছে, তা যদি একটু দয়া করে দেখাতেন! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এ ধরনের হাদীস উপস্থাপন করতে পারবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার বিষয়টা অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যাবে।

বিষয়টা এত বিস্তারিত করে বলার কারণ হচ্ছে, জনসাধারণের সামনে যখন আমরা এসব বিষয়ে আলোচনা করব, তখন জ্ঞানগত আলোচনার চেয়ে কৌশলগত আলোচনাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ এসব হেকমত এবং প্রজ্ঞা ব্যতীত আপনি যদি জ্ঞানের ভাণ্ডারও তাদের সামনে তুলে ধরেন, তাহলে অনর্থক সময়ের অপচয় বৈ আর কিছুই হবে না। এসব হেকমত অবলম্বনের ফলে বিষয়টির স্বরূপ জনগণের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। তারা সত্য-মিথ্যার মাঝে ব্যবধান বুঝতে পারবে।

প্রিয় পাঠক! আগামী কিস্তিতে রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে আরো কিছুটা আলোকপাত করা হবে। সাথে তারাবীর রাক'আত নিয়েও সামান্য আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বি.দ্র. আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

গ্রন্থনা ও অনুবাদ
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১২

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

রাসূল (সা.) কি হানাফী, শাফেয়ী... ছিলেন?

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন,

when we ask the muslim what are you? Some says I am hanafi, some says I am shafi, some say I am hanboli, some say I am a salafi. "What was the prophet (sallallahu alihi wasallam)? Was the prophet hanafi? Was he Shafa'i? was he Maleki? was he Hanboli? What was he?

কিন্তু আমরা যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজি কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, নাকি তিনি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন? আসলে তিনি কী ছিলেন?

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim -follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-ma y-2011&Itemid=199)

এক.

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কোরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, রাসূল কী ছিলেন? হানাফী? শাফেয়ী?...

আমাদের প্রশ্ন হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক যদি কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোনো মাসআলার সমাধান প্রদান করেন, কেউ যদি তাঁর কথা অনুযায়ী আমল করে, তবে এ কথা বলা কি ন্যায়সঙ্গত হবে যে, রাসূল (সা.) কী ছিলেন? রাসূল কি জাকির নায়েকপন্থী ছিলেন? সামান্য বুদ্ধি আছে, এমন কেউ এ ধরনের হাস্যকর প্রশ্ন করবে না। অথচ ডাক্তার জাকির নায়েকের মতো তথাকথিত একজন বিদ্যান ব্যক্তি এ ধরনের একটি প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক কি রাসূল (সা.)-এর অনুসারী, না রাসূল (সা.) ডাক্তার জাকির নায়েকের অনুসারী? ইমাম আবু হানীফা কি রাসূলের অনুসারী হবেন নাকি রাসূল (সা.) ইমাম আবু হানীফার অনুসারী হবেন? কোনটি হবেন? উম্মত নবীর অনুসারী হয়, নাকি নবী উম্মতের অনুসারী হন? ডাক্তার জাকির নায়েক কি এই সাধারণ কথাটা বোঝেন না?

ইমামগণ রাসূল (সা.)-এর অনুসারী ছিলেন কি না? এটি যথার্থ প্রশ্ন হতে পারে, কি? রাসূল (সা.) ইমামদের অনুসারী ছিলেন কি না, এটি কোন স্তরের প্রশ্ন? কেউ কি এ কথা বলতে পারবে যে, রাসূল (সা.) ওমরের অনুসারী ছিলেন, নাকি আবু বকরের? প্রশ্ন হতে পারে, আবু বকর ও ওমর কি রাসূল (সা.)-এর অনুসারী ছিলেন কি না। ডাক্তার জাকির নায়েকের মতো একজন কথিত বিদ্যান ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরনের অযৌক্তিক-হাস্যকর প্রশ্ন দুঃখজনক।

দুই.

ডাক্তার জাকির নায়েক যদি প্রশ্ন করতে চান যে, ইমামগণ রাসূল (সা.)-এর অনুসারী ছিলেন কি না? তবে আমরা বলব, ইমামগণ শতভাগ রাসূল (সা.)-এর অনুসারী ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি তাঁরা কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা তাঁদের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে ইমামগণের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হলো–

ইমাম আবু হানাফী (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন,

لم تزل الناس فى صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث .فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا .

মানুষ তত দিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে অবস্থান করবে, যত দিন তাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা হাদীস অন্বেষণ করবে। আর যখন তারা হাদীস ব্যতীত ইলম অন্বেষণ করবে, তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে?

[মিযানুল কুবরা, আল্লামা শা'রানী (রহ.), ১/১৫]

إياكم و القول فى دين الله بالرأى، وعليكم بإتباع السنة فمن خرج عنها ضل .

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া কথা থেকে বেঁচে থাকো! তোমাদের জন্য সুন্নাহের অনুসরণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি সুন্নাহের অনুসরণ থেক বের হলো, সে ভ্রষ্ট হয়ে গেল।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন,

السنن سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق

সুন্নাহ হলো নূহ (আ.)-এর জাহাজের মতো। যে তাতে আরোহন করল, সে নাজাত পেল, আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকল, সে ডুবে গেল।

ইমাম মালেক (রহ.) আরো বলেছেন,

ليس أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

রাসূল (সা.)-এর পরে তাঁর কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথা যেমন গ্রহণও করা যায়, আবার তা পরিত্যাগও করা যায়?

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন,

فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولى

আমি যদি এমন কোনো কথা বা এমন কোনো মূলনীতি প্রদান করি, যেটি রাসূলের হাদীসের বিপরীত হয়, তখন রাসূল (সা.) যা বলবেন, সেটিই আমার বক্তব্য।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন,

إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت

আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ কোনো কথা পাও, তবে তোমরা সুন্নাহের ওপর আমল করো এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন,

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

যে রাসূল (সা.)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের মুখে নিপতিত?

রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে যারা এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যকে ভ্রান্ত ও ইসলামবহির্ভূত প্রমাণের চেষ্টা করা, কতটা গর্হিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং চার ইমামও যে রাসূল (সা.)-এর শতভাগ অনুসারী ছিলেন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বরং সর্বযুগের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চার ইমামই শতভাগ ইসলামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তুমি কে? প্রশ্নের উত্তর

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন–

When one asks a Muslim, "who are you?" the common answer is either 'I am a Hanafi or Shafi or Maliki or Hanbali. Some call themselves 'Ahle-Hadith'.

যখন কোনো মুসলমানকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কে? সাধারণ উত্তর হলো, আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী অথবা হাম্বলী। কেউ কেউ নিজেকে আহলে হাদীস বলে।

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

আমরা এখানে ডা. জাকিরের এ বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করব।

বাস্তব জীবনে আমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তাহলে এর উত্তর আমরা কী দিয়ে থাকি?

এ বিষয়ে মৌলিক কথা হলো, এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভর করে।

কোনো অমুসলিম যদি কোনো মুসলিমকে প্রশ্ন করে, তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, 'আমি মুসলিম'।

আবার অপরিচিত কোনো মুসলিম যদি অপর মুসলিমকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তার উত্তর হবে 'আমি অমুকের ছেলে অমুক'।

এক দেশের লোক যদি কোনো বিদেশিকে প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?' তখন উত্তর হবে, আমি বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দুই ব্যক্তি যদি একে অপরকে প্রশ্ন করে তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, আমি গুজরাটি, আমি লাহোরি, আমি পাঞ্জাবি।

আবার কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কে? তখন সে বলবে সে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রেণীর ছাত্র।

এভাবে বাস্তব জীবনে মানুষ তুমি কে প্রশ্নের উত্তর স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী দিয়ে থাকে। অতএব, কোনো অমুসলিমের 'তুমি কে'? প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলিম বলবে? আমি মুসলিম। এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কখনও আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী...ইত্যাদি বলে না। ডা. জাকির নায়েক কিভাবে এ বিষয়টির অবতারণা করলেন আমাদের বোধগম্য নয়।

তবে এটুকু তো স্পষ্ট যে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এরূপ প্রশ্নের এরূপ উত্তর হয় কোনো অমুসলিম প্রশ্ন করলে। তাহলে ডা. জাকির নায়েক নিজেকে কী ভেবে প্রশ্নটির উত্তর এভাবে দিয়েছেন তা আমাদের জানা নেই!

তবে 'তুমি কে?' এ প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলিম কখন নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ইত্যাদি বলে থাকে? স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ধরুন! দুজন ব্যক্তি পাশাপাশি নামায আদায় করল, একজন নামাযে জোরে জোরে আমীন বলল, আরেকজন আস্তে আমীন বলল। এখন নামায শেষে একে অপরকে যদি প্রশ্ন করে? তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, আমি হানাফী, আরেকজন হয়তো বলবে আমি শাফেয়ী বা আহলে হাদীস...। আবার কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট করে জিজ্ঞেস করে, what is your madhab (তোমারা মাযহাব কী) অথবা what madhab do you follow? (তুমি কোন মাযহাবের অনুসারী) তখন এর উত্তর হতে পারে, আমি হানাফী, শাফেয়ী...আহলে হাদীস ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণভাবে কারও 'তুমি কে?' প্রশ্নের উত্তরে হানাফী, শাফেয়ী হিসেবে পরিচয়দানের বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক। সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরনের বিষয়ের অবতারণা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব

প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, 'ইযা সাহ্হাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী'। অর্থাৎ হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব। এ কথা উল্লেখ করে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীস ও সালাফীগণ যুক্তি দিয়ে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না, কেননা ইমামগণ সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলেছেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক একটু আগে বেড়ে বলেছেন,

That's the reason I say I am a hundred percent Hamboli, if Hamboli means the person who follows the teaching of Imam Ahmad Ibn Hambal, I am 100% Hamboli. Other people are 70%, 80%. So in these teachings, if you say, following

the teachings of Imam Abu Hanifa, may Allah's Mercy be on him, makes you a Hanafi, I am a 'Pakka' Hanafi, 100% Hanafi, if following the teachings of Imam Malek makes you a Maleki, I am 100% Maleki. If following the teachings of Imam Shafi, makes you a Shafi, I am 100% Shafi. If following the teachings of Imam Ahmad Ibn Hambol makes you a hamboli, I am a 100% 'Sau fi Sad' Hamboli. Because all these four great Aimmas said, if you find any of my fatwa that goes against Allah and his Rasul, throw my Fatwa on the wall.

আমি বলি, আমি শতভাগ হাম্বলী। যদি কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের নাম হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী। অন্যরা সত্তর ভাগ, কেউ আশি ভাগ, আমি একশ ভাগ হাম্বলী। যদি তুমি বলো, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অনুসরণ করলে কেউ হানাফী হয়ে যায়, তবে আমি একশ ভাগ হানাফী। ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনুসরণের কারণে কেউ যদি মালেকী হয়, তবে আমি শতভাগ মালেকী। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অনুসরণে কারণে কেউ যদি শাফেয়ী হয়, তবে আমি একশ ভাগ শাফেয়ী। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অনুসরণের কারণে কেউ যদি হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী। কেননা চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার ফাতওয়া যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) বিরোধী হয়, তবে আমার ফাতওয়া দেয়ালে ছুড়ে মার?

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

এক.

আমরা জানি যে প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব।

বিবেচনার বিষয় হলো, ইমামগণ যদি এ কথা নাও বলতেন, তবুও কি সকলের ওপর রাসূল (সা.)-এর সহীহ হাদীস অনুসরণ করা জরুরি নয়? কোনো মুমিন কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে, আমি রাসূল (সা.)-এর সহীহ হাদীস পেলেও সেটা মানব না?

আমরা ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন করব, কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে? কেউ যদি কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ করে, নিঃসন্দেহে সে মুসলমান থাকবে না।

আমাদের কথা হলো, কোরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কি কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করে দেখাতে পারবেন? কারও জন্য কি কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করা বৈধ?

সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলো, কোরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের সমস্ত আয়াতের ওপর আমল করা বৈধ নয়। কেউ যদি কোরআনের সমস্ত আয়াতের ওপর আমল করতে চায়, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা সকলেই অবগত ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদপান বৈধ ছিল। পবিত্র কোরআনে এ বৈধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

অর্থাৎ তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলুন, এতে মানুষের কল্যাণ ও বড় গোনাহ রয়েছে। আর এর গোনাহ তার কল্যাণের চেয়ে বড়। [সূরা বাকারা, আয়াত নং ২১৯]

তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আয়াতটি হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে পাঠ করা হলে তিনি দু'আ করলেন,

اللهم بَيِّن لنا فى الخمر بيان شفاء

হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করুন?

অতঃপর পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না?

এ আয়াতে শুধু নামাযের পূর্বে মদ খাওয়া অবৈধ করা হয়েছে।

এ আয়াত হযরত ওমরের সামনে তেলাওয়াত করা হলে, তিনি পূর্বের ন্যায় দু'আ করলেন, হে আল্লাহ মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বিধান দান করুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৯০ও ৯১ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ☆ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

অর্থ : (৯০) হে মুমিনগন! এই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন,

انتهينا، انتهينا

আমরা এ সমস্ত জিনিস থেকে বিরত হলাম, বিরত হলাম? (তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৪৯, আবু দাউদ ৩৬৭০)

এখন কেউ যদি বলে, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং এ আয়াতে তো মদ হারাম এ কথা বলা হয়নি। মাতাল অবস্থায় নামায না পড়লেই আয়াতের ওপর আমল হয়ে যাবে। সুতরাং নামায ব্যতীত অন্য সময়ে মদ পান করা বৈধ হবে।

সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত, এগুলো কি সহীহ নয়? এগুলো কি কোরআনের আয়াত নয়? এ দুই আয়াতের আলোকে কি ডাক্তার জাকির নায়েক মদ খাওয়া হালাল বলতে পারবেন? আর তিনি যদি হালাল বলেন, তবে তিনি মুসলমান থাকবেন? অথচ কোরআন সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে কোনো কিছু সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। চাই তা কোরআন হোক কিংবা হাদীস। কোরআনে যেমন নাসেখ-মানসুখ রয়েছে, রাসূল (সা.)-এর হাদীসেও নাসেখ-মানসুখ রয়েছে। আর এটি সর্বজনস্বীকৃত যে মানসুখের (রহিত) ওপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং নাসেখের (রহিতকারী বিধান) ওপর আমল করা আবশ্যক। এ ছাড়া হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির ওপর আমল করা হয় না। সুনির্দিষ্ট কারণে হাদীস পরিত্যাগ সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পেরে, নিজের অজ্ঞতাকে ইমামদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কালজয়ী উক্তি–

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر فى تركه.

প্রত্যেকের অবগত হওয়া জরুরি যে মুসলিম উম্মাহের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত ইমামদের কোনো ইমামই স্বেচ্ছায় রাসূলের কোনো সুন্নাতের বিরোধিতা করেননি। সুন্নাতটি ছোট থেকে ছোট হোক কিংবা বড় থেকে বড়। কেননা তারা সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ জরুরি এবং রাসূলের কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথাই যেমন গ্রহণ করা যায় আবার প্রত্যাখ্যানও করা যায়। কিন্তু তাদের কারও কাছ থেকে যদি এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, যা কোনো সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তবে বুঝতে হবে তার কাছে অবশ্যই যথার্থ কোনো প্রমাণ বা ওজর রয়েছে, যার কারণে তিনি সহীহ হাদীসটি গ্রহণ করেননি।'

কিন্তু বর্তমান যুগের স্বশিক্ষিত তথাকথিত মুজতাহিদগণের অবস্থা কী? তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল গাফফার হিমসি (রহ.) লিখেছেন–

لأنا نرى فى زماننا كثيرا ممن ينسب إلى العلم مغترا فى نفسه، يظن أنه فوق الثريا وهو فى حضيض الأسفل، فربما يطالع كتابا من الكتب الستة-مثلا-فيرى فيه حديثا مخالفا لمذهب أبى حنيفة فيقول :إضربوا مذهب أبى حنيفة على عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه سندا، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به، وهو لا يعلم بذلك, فلو فوض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقا :لضلوا فى كثير من المسائل، وأضلوا من أتاهم من سائل

বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। সে মনে করে যে, সে (ইলমের দিক থেকে) ছুরাইয়্যা তারকার তথা মঙ্গল গ্রহের ওপরে রয়েছে, অথচ বাস্তবতা হলো, তার অবস্থান পাতালের তলদেশে। উদাহরণস্বরূপ, এরা সিহাহ্ সিত্তা থেকে কোনো একটি হাদীসের কিতাব পড়ে এবং সেখানে কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের বিপরীত কোনো হাদীস পায়, তবে তারা বলে, 'আবু হানিফার মাযহাব দেয়ালে ছুড়ে মারো, আর রাসূলের হাদীস গ্রহণ করো।' অথচ হাদীসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা উক্ত হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার অন্য কোন হাদীস রয়েছে, অথবা এ-জাতীয় সুনিশ্চিত কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনোটিই জানে না। এ শ্রেণীর লোকদের হাতে যদি সাধারণভাবে হাদীস অনুসরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের নিকট যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পথচ্যুত করবে?

ডাক্তার জাকির নায়েক যে দাবি করেছেন, আমি শতভাগ হানাফী, শতভাগ মালেকী, শতভাগ শাফেয়ী, শতভাগ হাম্বলী এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা তাঁর এ বক্তব্য মূলত ইমামদের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মাযহাবসমূহকে খেল-তামাশার বস্তু বানানোরই নামান্তর। কারণ আমরা সকলেই জানি যে একই সাথে চার মাযহাব অনুসরণ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, একমাত্র তিনিই হয়তো সহীহ হাদীস মানতে আগ্রহী। ইমামগণ কি সহীহ হাদীস মানতেন না? কিংবা তাদের অনুসারী কেউ কি সহীহ হাদীস মানে না?

বিষয়টি এমন যেন চৌদ্দ শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিল না, চৌদ্দ শ' বছর পরে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীসগণ শুধু সহীহ হাদীস পড়ছেন। চৌদ্দ শ' বছরে কেউ হয়তো বোখারী পড়েনি, একমাত্র এরাই চৌদ্দ শ' বছর পরে এসে বোখারী পড়ছে। যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, যাঁরা

মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা সকলেই সত্তর ভাগ মাযহাবী ছিলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি একশ ভাগ মাযহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন; তাও আবার একই সাথে চার মাযহাবের একশ ভাগ অনুসারী!

বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হয়তো সহীহ হাদীস জানতেন না বা সহীহ হাদীস মানতেন না, এ জন্য ডা. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে তাঁরা হলেন সত্তর ভাগ বা আশি ভাগ মাযহাবী। আমরা সকলেই জানি, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মোফাসসির, উসুলবিদ, ঐতিহাসিক প্রায় সকলেই দীর্ঘ বার-তের শ বছর যাবৎ কোনো একটা মাযহাব অনুসরণ করেছেন। ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা সকলেই সত্তর ভাগ সহীহ হাদীস মানতেন, ইসলামের দীর্ঘ চৌদ্দ শ বছর পরে ডা. জাকির নায়েক দাবি করলেন যে তিনি একশ ভাগ সহীহ হাদীস মানেন!

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেছেন–

ولا تكن حاكما على جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلى مقام لم يصلوه.

মুমিনদের সকল বিষয়ে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি।

(রিসালাতুন ফিল খুরুজি আনিল মাযাহিবিল আরবা'আ, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) পৃষ্ঠা-২২)

যাঁরা ইমামদের এ সমস্ত কথার অপব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি মনে রাখা দরকার–

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অথবা মুসলমানদের অন্য কোনো ইমামদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে তারা কিয়াস কিংবা অন্য কোনো কারণে সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সে তাদের ওপর ভ্রান্ত বিষয় আরোপ করল এবং নিজের ধারণা অথবা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে তাদের ওপর মিথ্যারোপ করল।' [মাজমু উল ফাতাওয়া, ২০/৩০৪]

সার কথা হলো, প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ হলো, হাদীসটি আমলযোগ্য হতে হবে। কেননা হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য হয় না। এ বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিস, সমস্ত মোফাসসির, সমস্ত ফকীহ একমত যে, সকল সহীহ হাদীস আমলযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন,

أما الأئمة و فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة و من بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه على علم أنه لا يعمل به

ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোনো একটি হাদীস সহীহ হলে, তার ওপর তখনই আমল করেন, যখন কোনো সাহাবী, তাবেয়ী, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোনো একটি দল থেকে হাদীসটির ওপর আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে হাদীসের ওপর আমল না করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তার ওপর আমল করা জায়েয নেই; কেননা তার ওপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তাঁরা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন। (প্রাগুক্ত)

এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা হলো, ইমামগণের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মানুষের মাঝে মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো নিতান্ত-ই দুঃখজনক। প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটি আমার মাযহাব' তাঁদের এ বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,

إذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبي

অর্থাৎ 'হাদীসটি যখন আমলযোগ্য হবে, তখন সেটি আমার মাযহাব হবে।'

কিন্তু বর্তমানে লা-মাযহাবী বা কথিত সালাফীরা এ সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ করে, মানুষের মাঝে মাযহাবের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মাযহাবের বক্তব্যের বিরোধী কোনো হাদীস পেলে, সে সম্পর্কে কোনো ইলম হাসিল না করেই, মাযহাব এবং মাযহাবের ইমামদের সম্পর্কে বিষোদগার শুরু করে; অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাবে, উক্ত হাদীস পরিত্যাগের যথাযোগ্য কারণ রয়েছে।

বর্তমানে যারা সহীহ হাদীস অনুসরণের নামে নতুন নতুন মাযহাবের অবতারণার চেষ্টা করছে, তাদের অধিকাংশ মাসআলা এমন যে তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দীর্ঘ চৌদ্দ শ বছরের মুসলিম উম্মাহ একমত। যেমন, এরা বলে বীর্য পাক, এদের অনেকে বলে তা খাওয়া বৈধ, গান-বাদ্য জায়েয, জুমু'আর খুতবা যেকোনো ভাষায় দেওয়া জায়েয, কাযা নামায বলতে কিছু নেই, অর্থ না বুঝে কোরআন পড়লে কোনো সওয়াব হবে না, তারাবী বিশ রাক'আত নয়, আট রাকাত ইত্যাদি।

কোরআন অনুসরণ করতে গিয়ে যেমন মদকে হালাল করা যাবে না, তেমনি সহীহ হাদীসের অনুসরণের কথা বলে রহিত হাদীস দিয়ে গান-বাদ্য, বেপর্দা ইত্যাদিকে জায়েয বলা যাবে না। এগুলো মূলত সহীহ হাদীসের অনুসরণ নয়, হাদীস অনুসরণের ছদ্মাবরণে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা।

হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন,

ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه أطلع عليه و رده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উক্ত বক্তব্যের

ওপর তখনই আমল করা যাবে, যখন এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে, তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তিনি হাদীসটির ওপর আমল করেননি কিংবা হাদীসটির কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত বক্তব্যের আমল করা যাবে না।'

১. আল্লামা ইবনে হামদান (রহ.) লিখেছেন,

و ليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك و يعرف به، و قد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه

প্রত্যেক ফকীহের জন্য এই অনুমতি নেয় যে, বাহ্যিক হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করবে, যতক্ষণ না সে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করবে যে, এ হাদীসটির সাংঘর্ষিক কোনো দলিল আছে কি না, অথবা হাদীসটির বিধান রহিত কি না। এ ব্যাপারে সে যদি জ্ঞান না রাখে, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনেক হাদীসের ওপর ইচ্ছা করেই আমল করেননি, কেননা তাঁর নিকট সে সমস্ত হাদীসের বিধান রহিত ছিল (মানসুখ)।'

قال النووى فى "شرح المهذب" (١/١٠٤) : هذا الذى قاله الشافعى ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال :هذا مذهب الشافعى وعمل بظاهره ، وإنما هذا فيمن له رتبة الإجتهاد فى المذهب ، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعى رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعى كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه ، وماأشبهها ، وهذا شرط صعب قل من يتصف به ، وإنما اشترطوا ماذكرنا لأن الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك ، قال الشيخ أبو عمرو -هو الإمام ابن الصلاح : -ليس العمل بظاهر ماقاله الشافعى بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث .أهـ

ইমাম নববী (রহ.) 'শরহুল মুহাজ্জাব'এ লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ সহীহ হাদীস দেখলেই বলবে যে, এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব এবং বাহ্যিক হাদীসের ওপর আমল করবে। বরং এটি তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এর জন্য শর্ত হলো, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে, শাফেয়ী (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হননি অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সকল কিতাব অধ্যয়ন করা হবে এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম শিক্ষা করেছে, তাদের সব কিতাব মুতালা'আ করতে হবে। এটি একটি কঠিন শর্ত, যা অল্পসংখ্যক লোকই অর্জন করতে পারে। ফকীহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো এ কারণে আরোপ করেছেন যে, কোনো একটি হাদীস ত্রুটিযুক্ত, রহিত, সুনির্দিষ্ট অথবা হাদীসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনেক সহীহ হাদীসের ওপর আমল করেননি অথচ তিনি এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট সুনির্দিষ্ট দলিল ছিল। শায়খ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যা বলেছেন, তার বাহ্যিকের ওপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহ হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করতে পারবে না।'

মূলত রাসূল (সা.) হাদীস বর্ণনার দিক থেকে সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো হাদীস বা কোরআনের কোনো নির্দেশনা আছে কি না। হাদীসটির বিধান রহিত কি না, ইত্যাদি। একজন সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বড় বড় আলেমদের পক্ষেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা কঠিন। যাঁরা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন, তাঁরাই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

শরীয়তের বিষয়ে যারা কোনো জ্ঞান রাখে না, অথবা জ্ঞান থাকলেও যেটা ইজতেহাদের জন্য যথেষ্ঠ নয়, তারা সহীহ হাদীস পেলেই সেটা নিয়ে খুব মাতামাতি করে। অনেকে হয়তো এতটুকু জানে না, সহীহ হাদীস কাকে বলে, কখন সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা যায় এবং কখন সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

শায়খ আব্দুল গাফফার (রহ.) 'দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম' নামক একটি কিতাব রচনা করেন। এ কিতাব রচনার মূল কারণ ছিল, শামের তরাবলুস শহরের এক লোক হোমস শহরে আসে এবং শায়খকে বলে যে, আমাদের ওখানে একজন লোক রয়েছে, যার বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না, সে কাফের।

তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে তার কথার যুক্তি দেখাল যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না, আর যার নামায সহীহ হলো না, সে কেমন যেন নামায পড়ল না। আর যে নামায পড়ল না, সে কাফের।'

তখন শায়খ আব্দুল গাফফার (রহ.) এক বৈঠকে, দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উক্ত কিতাব রচনা করে তরাবুলুস শহরের ওই লোককে দিয়ে দিলেন।'

এ জন্যই হয়তো ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম লায়স বিন সা'য়াদ (রহ.)-এর ছাত্র, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ওহাব (রহ.) বলেছেন,

الحديث مضلة إلا للعلماء

আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হল গোমরাহীর কারণ।

ইমাম আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী (রহ.) লিখেছেন,

قال الإمام إبن أبى زيد القيروانى رحمه الله :(قال ابن عيينة :الحديث مضلة إلا للفقهاء) يريد :أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره و له تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء ، مما لا يقوم به إلا من استبحر و تفقه)

আল্লামা ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হলো ভ্রান্তির কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা হয়তো হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করবে, অথচ অন্য কোনো হাদীস দ্বারা এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথবা অন্যদের নিকট হাদীসের দলিল অস্পষ্ট থাকবে, অথবা হাদীসটি মূলত আমলযোগ্য নয়, যার সুস্পষ্ট কোনো কারণ রয়েছে, যা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

আমাদের সমাজে দেখা যায়, শরীয়তের বিষয়ে যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কোনো এক ইমামের এ ধরনের উক্তি মুখস্থ করে নিজেও যেমন ধোঁকায় পড়ে এবং অন্যকেও ধোঁকায় ফেলে। এ কথা বললে, অনেকেই হয়তো বলবেন, নবীজির হাদীসের ওপর একজন আমল করছে আর তার ব্যাপারে ভ্রান্ত হওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে?

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন,

و هنا تثور ثائرة أدعياء الدعوة إلى العمل فيقولون :هل يجوز لكم أن تحكموا بالضلال على من يعمل بالسنة و يفتى الناس بها؟!

فنقول :نعم إذا لم يكن أهلا لهذا المقام، فحكمنا عليه بالضلال لا لعمله بالسنة، معاذ الله بل لتجرئه على ما ليس أهلا له

'আমাদের সমাজে কিছু দাঈ রয়েছে, যাঁরা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করবেন, আপনারা এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন, যে রাসূলের সুন্নাহের ওপর আমল করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং সুন্নাহের আলোকে মানুষকে ফাতওয়া দিচ্ছে।'

আমরা বলব, যেহেতু সে এ কাজের যোগ্য নয়, এ জন্য তাকে আমরা তার ভ্রান্তির ব্যাপারে ফায়সালা দিচ্ছি, সে সুন্নাহের ওপর আমল করছে এ কারণে নয়। বরং সে যে বিষয়ের যোগ্য নয়, সে বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণে এই ফায়সালা দেওয়া হচ্ছে।'

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : ইমামতি

মুহা: আমিনুল হক

ঘোড়াশাল বাজার, পলাশ, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা-১

কোনো ইমাম যদি নামাযের ক্বেরাত লাহনে জলী করেন তাহলে তাঁর পেছনে নামায আদায়ের হুকুম কী?

সমাধান-১

যে ইমাম সাহেব নামাযের ক্বেরাতে লাহনে জলী করেন, কেরাত শুদ্ধ করা পর্যন্ত তাঁর পেছনে নামায পড়া যাবে না। কারণ অনেক সময় লাহানে জলীর দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়। (কিফায়াতুল মুফতী ৪/২৮)

জিজ্ঞাসা : ২

ইমাম সাহেব যদি নিজের ছবি তুলে ফেইসবুকে প্রচার করেন তাঁর পেছনে নামায আদায় করা শরীয়তসম্মত কি না? ইমাম যদি দাড়িতে কালো খেজাব ব্যবহার করে সাদা দাড়িগুলোকে কালো করার জন্য তাহলে তাঁর ইমামতির হুকুম কী? এবং এ ধরনের ইমামের পেছনে নামায আদায়ের হুকুম কী?

সমাধান : ২

প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব উল্লিখিত কাজসমূহ থেকে তাওবা না করলে তাঁকে ইমাম বানানো জায়েয হবে না। অবশ্য তাঁর পেছনে আদায়কৃত নামায সহীহ হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ ৩/২৯৪)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মুহা: আবু বকর

গোপালনগর ইউনিয়ন পরিষদ, ধুনট, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের সমাজের নিয়ম হলো কুরবানীদাতাগণ কুরবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য রাখে, আরেক ভাগ আত্মীয়স্বজনকে দেয়, আরেক ভাগ সমাজে জমা দেয়। সমাজের পক্ষ থেকে আবার উক্ত গোশতগুলো ভাগ করে গরিব-মিসকিনসহ কুরবানীদাতাকেও দেওয়া হয়। জনৈক মুফতী সাহেব বলেছেন, উক্ত ভাগ কুরবানীদাতার জন্য নেওয়া ঠিক হবে না, কেননা এটা কুরবানীদাতার দান। আমার জানার বিষয় হলো, সমাজের উক্ত ভাগ কুরবানীদাতা নিজে না নিয়ে তার পিতা-মাতা বা ছেলে-মেয়ে অথবা পরিবারের অন্য কেউ নেয় তাহলে বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

শরীয়ত কুরবানীদাতাকে গোশতের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। সে চাইলে সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দিতে পারে, আবার চাইলে সম্পূর্ণ গোশত নিজের জন্যও রেখে দিতে পারে। তবে উত্তম হলো, সম্পূর্ণ গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া, আর এক ভাগ গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া। প্রশ্নে বর্ণিত সামাজিক প্রথাটি যেহেতু শরীয়ত স্বীকৃত পদ্ধতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্জনীয়। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ৫/১১৩)

প্রসঙ্গ : কুরবানীর চামড়া

মুহা: আব্দুল্লাহ

মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কুরবানীর পশুর চামড়া বা গোশত বিক্রয় করার হুকুম কী? মূল্য সদকার উদ্দেশ্যে চামড়া বা গোশত বিক্রয় বৈধ কি না? উভয়ের হুকুমের মাঝে কোনো ব্যবধান আছে কি?

সমাধান :

কুরবানীর পশুর চামড়া, গোশত বা চর্বি ইত্যাদির হুকুম এক ও অভিন্ন। এগুলোকে কুরবানীদাতা নিজেও রাখতে পারে, বা কাউকে দিতে পারে। নিজ প্রয়োজনে নগদ টাকায় এর কোনো অংশ বিক্রয় করা নাজায়েয। তথাপি যদি কেহ বিক্রি করেই ফেলে, তাহলে বিক্রয়লব্ধ টাকা গরিবদের সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি নগদ টাকা সদকা করার সুবিধার্থে বিক্রি করে তবে ওই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হলেও, সরাসরি সদকা করা সর্বাবস্থায় উত্তম। (শামী ৬/৩২৮)

প্রসঙ্গ : মোবাইল লোড

মুহা: আলী মর্তুজা

মিরপুর-১২, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং, ইনক্যাশ, লোডের বিধান ও মোবাইলের মাঝে ব্যালেন্স না থাকায় ৫ টাকা ধার করলে, কোম্পানি ৬.৪২ টাকা কেটে নেয়, এটা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

সমাধান:

বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং,

ইনক্যাশ, লোড শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। আর ৫ টাকা ধার করলে ৬.৪২ টাকা কেটে নেওয়ার বিষয়টি সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং পাঁচ টাকার টকটাইম অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয়ের নামান্তর, যা বৈধ। (রদ্দুল মুহতার ৬/৬৪)

প্রসঙ্গ : প্রকাশনার স্বত্বাধিকার

মুহা: আলী আশরাফ
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন মাকতাবা কর্তৃক বিদেশি মাকতাবা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন কিতাবাদি ফটোকপি করে বাজারজাত করা হচ্ছে। স্পষ্টত বোঝা যায়, বিদেশি মাকতাবাগুলো ওই সমস্ত কিতাব ছাপানোর অনুমতি দেয়নি। এমনকি আরবীতে লেখা থাকে حقوق الطبع محفوظة এ অবস্থায় এভাবে ফটোকপি করে বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? আর জেনেশুনে এ সমস্ত কিতাব ক্রয় করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

বিদেশি মাকতাবা থেকে প্রকাশিত কিতাবাদি ক্রয় করার পর অন্য মাকতাবার জন্য তা ফটোকপি করে বিক্রয় করা জায়েয হবে, যদিও প্রকাশিত কিতাবাদিতে حقوق الطبع محفوظة লেখা থাকে, আর জেনেশুনে এ সমস্ত কিতাব ক্রয় করাও বৈধ হবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৫০৬, জাওয়াহেরুল ফিকহ ২/৩৩৫)

প্রসঙ্গ : ইজারা

মুহা: যাকারিয়া হোসাইন
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

যায়েদ, ওমরকে জমি ভাড়া দিল এবং সাথে এই শর্ত করল যে এক বিঘা জমির বার্ষিক ভাড়া ১০০০ (এক হাজার) টাকা কিন্তু আমাকে ১০ বছরের ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা অগ্রিম দিতে হবে এবং এই নির্দিষ্ট ১০ বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি চাইলে এই লেনদেন রহিত করতে পারব। অথবা ওমর ভাড়া নেওয়ার সময় এই শর্ত করল যে কমপক্ষে ৫ বছর এই লেনদেন রহিত করতে পারবেন না। এ রকম শর্তের সাথে জমি ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

এ ধরনের শর্ত সাপেক্ষে ইজারা চুক্তি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তবে শর্ত ছাড়া নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন করার পর গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে উক্ত মু'আমালা রহিত করতে চাইলে উভয়ের সম্মতিক্রমে তা করা যাবে। (আল মুহীতুল বুরহানী ৯/৯৯)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

জামগ্রাম বাজার এলাকাবাসী, কাহালু, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় এক ইমাম সাহেবের দাড়ি এক মুষ্টি থেকে কম। তিনি দাড়ি ছাঁটাই করেন এবং ক্বেরাত মাখরাজসহ আদায় করেন না। কিছু লোকে তাঁকে বড় জাননেওয়ালা মনে করে তাঁর ইক্তিদা করে। আর কিছু লোক তাঁর ইমামতিতে নারাজ। ইমাম সাহেবকে দাড়ি বড় রাখতে বললে তিনি বলেন, দাড়ি-টুপির মধ্যে ইসলাম নেই। রাসূল (সা.) হাদীসে বলেছেন যে চল্লিশ গজ দূর থেকে দাড়ি বোঝা গেলেই হবে। সৌদির লোকেরা দাড়ি ছোট রাখে। মিসরের লোকেরা দাড়িই রাখে না। তারা কি ইমামতি করেন না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর চেয়ে খাটো করা বা একেবারে ছেঁচে ফেলা হারাম ও কবীরা গোনাহ। এ ব্যাপারে সকল ফেকাহ বিশারদ একমত। সুতরাং যে ব্যক্তি দাড়ি কেটে এক মুষ্টির কম করেন বা একেবারেই ছেঁচে ফেলেন এ ধরনের ব্যক্তির ইমামতি এবং তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। তাওবা করে নিজের ভুল শুধরে না নিলে তাঁকে ইমামতির পদ হতে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অধিকারী নেককার যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। চল্লিশ গজ দূর থেকে দাড়ি বোঝা গেলেই হবে, এই ধরনের কথা সঠিক তথ্যভিত্তিক নয়। আর সৌদি আরব ও মিসরের সবাই দাড়ি ছোট রাখে না বরং বহুসংখক লোক এক মুষ্টি ও তার চেয়েও লম্বা দাঁড়ি রাখে। তা ছাড়া সৌদি ও মিসরের লোক ইসলামী আদর্শের নমুনা নয়। এ ধরনের কথা কোনো বিবেকবান আলেম বলতে পারেন না। (বুখারী ২/৮৭৫)

প্রসঙ্গ : তারাবীর হাদিয়া

মাও. আবুল কালাম
চরমটুয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা-১

কোনো মসজিদে খতমে তারাবীহ পড়ানোর পর টাকা দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বে কোনো চুক্তি বা কোনো ধরনের আলোচনা ব্যতীত বিদায়ের সময় হাফেজ সাহেবকে হাদিয়াস্বরূপ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

জিজ্ঞাসা-২

কোনো মসজিদের ইমাম বা খতিব যদি ওই মসজিদের খতমে তারাবীহ পড়ান, তাহলে ওই ইমাম বা খতিবকে খতম তারাবীর পর হাদিয়া দেওয়ার বিধান

কী?

সমাধান-১

খতম তারাবীহের বিনিময় নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় পারিশ্রমিক আদান-প্রদান হাদিয়ার নামে হলেও নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৭৩)

সমাধান-২

মসজিদের নির্ধারিত ইমাম বা খতিবকে খতম তারাবীহের পারিশ্রমিকস্বরূপ হাদিয়া প্রদান বৈধ হবে না। হ্যাঁ, তাদের বেতনের অংশ হিসেবে নির্ধারিত ঈদ বোনাস প্রদান করা যাবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১০/২৫৪)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. হুসাইন আনসারী
উখিয়া, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা-ক

এক ব্যক্তি মুসল্লিদের ওজু-ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন পুরা করার লক্ষ্যে একটি মোটর বসায়। এটি মুসল্লিদের জন্য যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কমিটির কিছু লোক মসজিদের উন্নয়নের নামে ওই মোটর উঠিয়ে এর চেয়ে বেশি পাওয়ারের মোটর বসিয়ে মসজিদের আশপাশের জমি চাষাবাদ করতেছে। আমার প্রশ্ন হলো, প্রথম ব্যক্তির মোটরের পানি যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা একেবারে উঠিয়ে ফেলে বিনা প্রয়োজনে ওই স্থানে অন্য মোটর বসানোর ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

জিজ্ঞাসা-খ

আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি মসজিদের নামে একটি জায়গা ওয়াকফ করেছে। তার ইন্তিকালের অনেক দিন পর তার পরিবারস্থ লোকেরা মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত ওই জায়গার এক পার্শ্বে তাদের পরিবারের জন্য কবরস্থান বানিয়েছে। তাদের এই কাজের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

সমাধান-ক

ওজু-ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন পুরা হওয়া সত্ত্বেও মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে কমিটির লোকেরা উন্নতমানের মোটর বসাতে পারবে। তবে বিনা পয়সায় অন্যের জমিতে উক্ত মোটর দ্বারা সেচ দিতে পারবে না। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২১)

সমাধান-খ

মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় কবরস্থান বানানো জায়েয নয় বিধায় সন্তানদের জন্য পিতার ওয়াকফকৃত জায়গার এক পার্শ্বে কবরস্থান বানানো জায়েয হয়নি। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৮, এমদাদুল ফাতাওয়া)

প্রসঙ্গ : যাকাত, শিরকত

মুহা: মাহমুদ হাসান
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-

কোনো ব্যক্তি নিজের যাকাতের টাকা উপযুক্ত ব্যক্তির মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড করে দিলে তার যাকাত আদায় হবে কি না? যদি আদায় হয় কখন আদায় হবে? ওই টাকা মোবাইলে পৌঁছার সাথে সাথে না টাকা খরচ হওয়ার পর?

সমাধান-

ফ্লেক্সিলোডের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১২৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: আশরাফ আলী
জোয়ারসাহারা, লিচু বাগান।

জিজ্ঞাসা :

নুরুদ্দীন খান ১ কাঠা এবং ধনু মিয়া ০.৫ (আধা) কাঠা জায়গা 'জোয়ারসাহারা বাজার জামে মসজিদ'-এর জন্য ওয়াকফ করেন। উক্ত ১.৫ (দেড়) কাঠা জমিতে মসজিদ নির্মাণ করেন। জনাব খবিরুল আলম চৌধুরী উক্ত মসজিদের বৃহদায়তনের ইচ্ছায় আরো কিছু জায়গা (৪.৭৫ পৌনে পাঁচ কাঠা) বাড়ানোর লক্ষ্যে আশপাশের কিছু দোকান এবং জমি মসজিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করেন এবং এ যাবৎ মূল মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করে উক্ত (৪.৭৫ পৌনে পাঁচ কাঠা) জমিতে টিনশেড করে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ মুসল্লিগণ নামায পড়ে আসতেছেন। আজ অবধি উক্ত (৪.৭৫ পৌনে পাঁচ কাঠা) জমি খবিরুল আলম চৌধুরী ওয়াকফ করেননি। ওয়াকফের কথা বলা হলে তিনি উক্ত জমি "খাস" বলে ওয়াকফের বিষয়কে এড়িয়ে যান এবং মৌখিকভাবে বলেন আমি তো মসজিদের জন্য দিয়েই দিয়েছি। বর্তমানে মুসল্লিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মুসল্লিগণ মসজিদ বৃহদায়তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে খবিরুল আলম চৌধুরী উপরোক্ত ওয়াকফকৃত দেড় কাঠা ছাড়া তার ক্রয়কৃত (৪.৭৫ পৌনে পাঁচ কাঠা) জমিতে কমপ্লেক্স/বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। বি.দ্র. মোট (৬.২৫ সোয়া ছয় কাঠা) জমির মধ্যে ১০ তলা কমপ্লেক্সে, যার নিচতলায় মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় মসজিদ, চতুর্থ তলায় ব্যাংক-বীমা, পঞ্চম তলায় মাদরাসা, ষষ্ঠ তলায় ডাক্তারদের চেম্বার, সপ্তম তলায় আবাসিক ছাত্রাবাস, ১০ তলা ভবনের বাকি অংশ তার ব্যক্তিগত। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে আমরা সমাধান

চাই?

সমাধান :

জনাব খবিরুল আলম (৪.৭৫ পৌনে পাঁচ কাঠা) জমি মসজিদের জন্য লিখিত ওয়াকফ না করলেও মৌখিকভাবে 'আমি তো মসজিদের জন্য দিয়েই দিয়েছি' বলা এবং দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ উক্ত জায়গায় মসজিদ বানিয়ে নামায পড়ার মধ্যে কোনো ধরনের আপত্তি না করায় উক্ত জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে, আর কোনো জায়গাতে একবার মসজিদ হলে তার উপরে-নিচে আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই গণ্য হয়। অতএব উক্ত জায়গার ওপরে-নিচে মসজিদ ছাড়া ব্যাংক-বীমা, মাদরাসা, ডাক্তারদের চেম্বার, ছাত্রাবাস, ব্যক্তিগত ভবন ইত্যাদি কোনো কিছুই বানানোর অবকাশ নেই। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৬, আল বাহরুর রায়িক ৬/৪৬০)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: ফারুক আহমেদ
মসজিদ পরিচালনা কমিটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

৩২/৮-ক, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর "মসজিদ-ই বায়তুল ফিরদাউস" ১৯৬৮ সাল হতে উক্ত প্লট মসজিদ হিসেবেই পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত প্লটের পশ্চিম এবং উত্তরাংশ সে সময় থেকেই মাটি ভাড়া হিসেবে চলছিল। পরবর্তী ১৯৯৬ সালে মসজিদ কমিটি উক্ত স্থান মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফাউন্ডেশন করে বিল্ডিং তৈরি করে নিচতলায় ১৬টি দোকানঘর বানিয়ে তার পজিশন বিক্রি করে এবং ওপরে বিভিন্ন অফিস ও ব্যাংককে ভাড়া দেয়। যার আয় দিয়ে মসজিদটি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্লট সরকারি হাউজিং কর্তৃক বরাদ্দকৃত, যা ২১/৪/২০০৪ ইং মসজিদের বরাবর রেজিস্ট্রি হয়। বর্তমানে মসজিদের মুসল্লি বাড়তে থাকে। যার কারণে মসজিদে মুসল্লিদের জায়গা সংকুলান হয় না। উল্লেখ্য, শুধু মসজিদটি ফাউন্ডেশন ছাড়া তৈরি। এমতাবস্থায় বর্তমান মসজিদ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মসজিদ এবং মার্কেট ভেঙে আন্ডারগ্রাউন্ডে মার্কেট করে তার ওপর থেকে মসজিদ বানানোর প্রস্তাব করছে। প্রশ্ন হলো, মসজিদ এবং মার্কেট ভেঙে আন্ডারগ্রাউন্ডে মার্কেট করে তার ওপর থেকে মসজিদ করলে তা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

সমাধান:

শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের যে অংশকে একবার নামাযের জন্য নির্ধারণ করা হয় তার পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত কেয়ামত অবধি মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। সেখানে অন্য কিছু করা মসজিদের স্বার্থে হলেও বৈধ নয়। এ হিসেবে নতুন নির্মাণকালে আপনাদের পুরাতন মসজিদের কোনো অংশের আন্ডারগ্রাউন্ডে মার্কেট বানানো শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (আদ্দুরুল মুখতার ১/৩৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৫৫)

প্রসঙ্গ : ইন্টারনেট ব্যবহার

মুহা: নাজমুল কবীর
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তি নামাযী এবং সুন্নাতের অনুসারী। বিভিন্ন কারণে তার ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। যেমন একাডেমির, প্রফেশনাল প্রয়োজন, চাকরি খোঁজা তথ্যমূলক বিষয়াদি খোঁজা ইত্যাদি। সে ইন্টারনেটে হকপন্থী বিভিন্ন ইসলামিক সাইট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এগুলো শেয়ার করে মানুষকে অবগত করে এবং বাতিলপন্থীদের বিভিন্ন বক্তব্যের শিক্ষণীয় জবাবও প্রদান করে। এতে তার নিজের এবং অন্যদের বেশ উপকার হয় বলে বাহ্যিকভাবে মনে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, হঠাৎ অল্প সময়ের জন্য তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সে ইচ্ছাকৃতভাবে চোখের খিয়ানত বা কুদৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। কিছুক্ষণ পর আবার তার চেতনা ফিরে আসে, সে তাওবা করে এবং লজ্জিত হয়। আবার কুদৃষ্টি করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কিছুদিন পর ইচ্ছাকৃতভাবে আবার সেই গোনাহে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে মাঝে মাঝে ইন্টারনেট ব্যবহার থেকেই একেবারে বিরত হতে চায়। কিন্তু এর উপকারী ও প্রয়োজনীয় দিকসমূহের কারণে আবার বিরত হয় না। প্রশ্ন হলো, আলোচ্য ব্যক্তির জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের হুকুম কী এবং যদি হারাম বা নাজায়েয হয়, তবে তা কত দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে?

সমাধান :

ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো ভালো দিক, অপরটি হলো মন্দ দিক। তাই এর ব্যবহারের ওপরই হুকুম আরোপ করা হবে। যেমন এটিকে যদি অবৈধ ও গোনাহের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা নাজায়েয হবে। আর যদি বৈধ ও জায়েয কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা জায়েয হবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু চেষ্টা করার পরও কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে পারছে না, তাই তার জন্য ইন্টারনেট পরিহার করা আবশ্যক। (সূরা লোকমান-২, মিশকাত পৃ. ২৭০)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) মালটার জেলখানা থেকে ফিরে আসার পর দারুল উলূম দেওবন্দে একদিন উলামায়ে কেরামের বিশাল জাম'আতের সামনে বললেন, মালটার বন্দি জীবন থেকে আমি দুটি সবক শিখে এসেছি। আমি জেলখানায় একাকিত্ব জীবনে চিন্তা করেছি যে আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবী অধঃপতন কেন? এর দুটি কারণ আমার বুঝে এলো ১. মুসলমানরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছে। ২. আপসের মতানৈক্য ও গৃহযুদ্ধ।

তাই আমি সেখান থেকে পাক্কা এরাদা নিয়ে এসেছি যে বাকি জীবন কোরআন করীমের ব্যাপক শিক্ষার পেছনে অতিবাহিত করব এবং মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আপসের লড়াই কখনো বরদাশত করা যাবে না। (আহলে দিলকে আনমূল আকওয়াল ৮০)

মুরীদের জন্য অপরিহার্য দুটি জিনিস

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) খুবই সুন্দর বলেছেন যে, আল্লাহর পথের পথিক মুরীদের জন্য যদি দুটি জিনিস অর্জন হয়ে যায় অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণ ও পীরের মুহাব্বত তাহলে তাকে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাজারো অন্ধকারে নিমজ্জিত মনে হয় বাস্তবে সে হেদায়েতের আলোর মধ্যেই আছে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এই দুটি জিনিস নেই, সে যদিও বাহ্যিকভাবে নূরান্বিত, বাস্তবে সে অনেক অন্ধকারে নিমজ্জিত। (কামালাতে আশরাফিয়্যা)

আত্মশুদ্ধির প্রেসক্রিপশন

হযরত ইবরাহী খাওয়াচ (রহ.) ইরশাদ করেন যে আত্মার আরোগ্য লাভ করার ওষুধ পাঁচটি–

১. গভীরভাবে চিন্তা করে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। ২. পেট খালি রাখা। ৩. তাহাজ্জুদ পড়া। ৪. শেষ রাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করা। ৫. সালেহীন তথা নেককারদের সুহবতে বসা। (কাশকুলে মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান ২১৪)

দুটি মহৎ গুণ

হযরত মাওলানা কারী আমীর হোসাইন (রহ.) বলেন, হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত দুটি গুণ মানুষের জন্য বহু বড় নেয়ামত। ১. সাখাওয়াত-দানশীলতা। ২. কুদৃষ্টি থেকে চোখের হেফাজত। তিনি বলেছেন, কুদৃষ্টি এমন মারাত্মক যে এর দ্বারা ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। (কালিমাতে সিদক ও আদল)

যাদের থেকে দূরে থাকবেন

হযরত জাফর সাদেক (রহ.) বলেন, পাঁচ ধরনের মানুষের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকবেন। ১. মিথ্যুক। কেননা সে ধোঁকায় লিপ্ত করে দেয়। ২. বোকা থেকে। কেননা সে যতই তোমার কল্যাণ কামনা করবে, ততই তোমার ক্ষতি হবে। ৩. কৃপণ থেকে। কেননা তার সংশ্রবে প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাবে। ৪. কাপুরুষ থেকে। কেননা সে সময়ে সঙ্গ ত্যাগ করবে। ৫. ফাসেক থেকে। কেননা সে এক লোকমা খাবারের লোভে একাকী হয়ে মুসীবতে লিপ্ত করে দেয়। (তাযকিরাতুর আওলিয়া ১৩)

আল্লাহর ওলীর গুণাবলি

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) বলেন, আল্লাহ পাক যাঁকে ওলী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন তাঁর মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলির সমাবেশ হয়ে থাকে। ১. অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন করে রাখা। ২. সুহৃদয় হওয়া। ৩. সত্যানুসারী হওয়া। ৪. সৎকর্মে উদ্যোগী হওয়া। ৫. রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা। ৬. সৎসাহসী হওয়া। ৭. নরম মেযাজ হওয়া। ৮. সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ হওয়া। ৯. অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধকারী হওয়া। ১০. প্রয়োজনীয় ইলমের সমন্বয় ঘটা। ১১. গরিব-মিসকীনদের প্রতিপালনকারী হওয়া। (কুড়ানো মানিক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

সুন্নাতের অনুসরণ

জনৈক আলেম মাওলানা ফজলে রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.)-এর নিকট আরজ করলেন, হুজুর! আপনি কোন ভালো আমল করেছেন, যার কারণে আপনি এত উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের ওপর আমল করে।' তিনি অন্য একপর্যায়ে বলেন, গাউস বা কুতুব হওয়া সুন্নাতের অনুসরণ বৈ কিছুই নয়।

অন্য প্রসঙ্গে বলেন, সুন্নাতের অনুসরণ হলো প্রতিটি আমল রাসূল (সা.) যেভাবে করেছেন, সেভাবে করা এর চেয়ে কমাবেও না, বাড়াবেও না। (আহলে দিলকে আনমূল আকওয়াল ৮৪, ৮৬)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩